দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ১ সেপ্টেম্বর - ২০১৪।। ১৫ ভাদ্র - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৫ ভাদ্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১ সেপ্টেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

ইজরায়েলকে দেখে শিক্ষা নিতে হবে, জঙ্গিদের সঙ্গে কোনো আপোস নয় □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : সিঙ্গাপুরে পাগলু ডান্স, ‘থোড়া সা কর লে রোমান্স’ □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্যে বাংলা টলমল □ সুমিত্র মিত্র □ ১২

ভারতীয় কৃষির পুনর্গঠন □ ড. রঘুবংশমণি পাণ্ডে □ ১৪

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ— একটি পরিচয় □ অজিত কুমার বারিক □ ১৬

কৃষি ও কৃষককে বাঁচাতে জৈবিক চাষের দ্রুত প্রয়োজনীয়তা □ নগেন্দ্রনাথ বর্মন □ ১৭

কৃষক-দেবতা ভগবান বলরাম □ অজিত কুমার বারিক □ ২১

পৌরাণিক নগর কলিঙ্গ □ গোপাল চক্রবর্তী □ ২৩

বিদেশনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতার ছাপ রাখছে বিদেশমন্ত্রক □ ময়ূরী মুখার্জি □ ২৭

ডব্লিউ টি ও বিতর্ক : দেশের মানুষের খাদ্য-সুরক্ষা নিশ্চিত করাতেই মোদী সরকারের অধিক গুরুত্ব □ এন. সি. দে □ ২৯

উত্তর দিনাজপুরের ‘তুলাইপঞ্জি’ এখন বিদেশী মুদ্রা আনতে পারে □ বাসুদেব পাল □ ৩০

ধর্ষণ— এ কোন কালচার? □ প্রীতীশ তালুকদার □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সুস্বাস্থ্য : ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮** □ **রঙ্গম : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □

প্রকাশিত হবে
৮ সেপ্টেম্বর
২০১৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সঙ্কটে উত্তরবঙ্গের চা-শিল্প

ভারতীয় আতিথেয়তার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ চা। চা-শিল্পকে বাদ দিয়ে উত্তরবঙ্গের আর্থিক, সামাজিক ও শিল্প-মানচিত্র কল্পনা করা যায় না। সেই চা-শিল্পই এখন চরম সঙ্কটে। একটার পর একটা চা-বাগান বন্ধ হচ্ছে। চা-বাগানের শ্রমিকরা দুঃসহ জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই বিষয় নিয়েই এবারে আলোচনা করেছেন সৌমেন নাগ, রামঅবতার শর্মা ও ভীষ্মদেব মেধি।

দাম একই থাকছে - ১০ টাকা ।। সত্বর কপি বুক করুন।।

প্রকাশিত হবে
৮ সেপ্টেম্বর
২০১৪

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

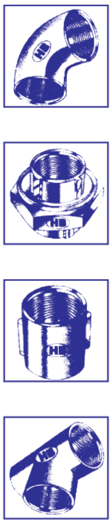

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE ®

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানের যুদ্ধংদেহি মনোভাব কেন?

প্রধানমন্ত্রী হইয়াই নরেন্দ্র মোদী প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য উদ্যোগ লইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভারত-পাকিস্তানের ভিতর সমস্ত বিবাদ যাহাতে নির্মূল হইয়া দুই দেশ একই সঙ্গে উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। কিন্তু তেলে জলে যে মিশ খাইতে পারে না তাহা আবার প্রমাণিত হইতেছে। দুই দেশের সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক, দুই দেশের রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক, দুই দেশের মানুষের মনোভাব পৃথক হইলে বন্ধুত্ব কেমন করিয়া সম্ভব? পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হইলেও সেই দেশের সরকার সেনা এবং আই এস আই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেনা এবং আই এস আই জোট আবার যে কোনোও গণতান্ত্রিক সরকারকে নড়বড়ে করিয়া দিবার পাশাপাশি সীমান্তে হামলা চালাইয়া ভারত-পাক আলোচনা প্রক্রিয়া হিমঘরে পাঠাইয়া দিতে সিদ্ধহস্ত। ভারত বন্ধুত্বের হাত বাড়াইয়া দিলেও পাকিস্তান সে হাত ধরিতে ইচ্ছুক নহে। তাই সীমান্তে গোলাগুলি চলিতেছে। পাক রাষ্ট্রদূত এই দেশে সরকারের সহিত আলোচনা করিতে আসিয়া কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সহিত বৈঠক করিতেছেন। গৃহের অতিথি গৃহের শত্রুর সহিত মেলামেশা করিলে কোন গৃহস্থ আর অতিথিকে সম্মান করিয়া থাকে? তাই ভারত-পাক বৈঠক বাধ্য হইয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হইয়াছিল বলিয়া দুই দেশের মানুষের মনোভাবও বন্ধুত্বপূর্ণ হিসেবে গড়িয়া ওঠে নাই। ধর্ম আলাদা হইয়াই যত বিপত্তি হইতেছে। শুরু হইতেই পাকিস্তানের মনোভাব হইতেছে ভারতের ভূমি দখল করা, সম্ভব হইলে সম্পূর্ণ দেশটিকেই কব্জা করা। সেই লক্ষ্যে তাহাদের কর্মপদ্ধতি চলিতেছে। এই কর্মপদ্ধতি হইল ছায়াযুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিকই বলিয়াছেন, পাকিস্তান সরাসরি যুদ্ধ করিয়া সুবিধা করিতে পারিবে না বলিয়া ছায়াযুদ্ধ করিতেছে। কাশ্মীরে ছায়াযুদ্ধই চলিতেছে। সিরিয়ায় হইচই ফেলিয়া দেওয়া জঙ্গি সংগঠন 'ইসলামিক স্টেট' জম্মু-কাশ্মীরে সংগঠন বিস্তার করিতেছে পাকিস্তানপন্থীদের সহায়তায়। উল্লেখ্য, জম্মু-কাশ্মীরের মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ মাত্র শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। উত্তরপ্রদেশে আই এস আইয়ের সহায়তায় নানা অপকর্ম চলিতেছে। দাঙ্গা, নারীধর্ষণ ও ধর্মান্তকরণ এই অপরাধের মধ্যে অন্যতম। সমীক্ষায় প্রকাশ উত্তরপ্রদেশে ১০০টি অপরাধের ঘটনার মধ্যে ৭১টিই মহিলাদের বিরুদ্ধে এবং ৯৯.৯ শতাংশ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এবং এই ক্ষেত্রে আই এস আইয়ের প্রত্যক্ষ সমর্থন রহিয়াছে।

দেখা যাইতেছে পাকিস্তান যখন দেশের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং সীমান্তে লাগাতার হামলা চালাইতেছে তখন কেবল মুসলমান ভোটের লোভে একশ্রেণীর রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের সমর্থনে সোচ্চার। মুসলমান ভোটের লোভে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত নয়। হামলাকারীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া কি হামলা বন্ধ করা সম্ভব? হামলাকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দাবি মানিতে হইলে তো সমগ্র দেশটাকেই আই এস আই জঙ্গিদের হাতে তুলিয়া দিতে হয়। গৃহশত্রুরা ইতিমধ্যে সেই কাজও শুরু করিয়া দিয়াছে। এদেশে অল্পবয়সী হিন্দু মেয়েদের বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়া বা প্রেমের ফাঁদে ফেলিয়া ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা চালাইতেছে মুসলমান যুবকেরা। শ্লোগান হইতেছে হিন্দু সাজিয়া মেয়েদের ফাঁদে ফেলিয়া; তারপর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা। দেশকে বাঁচাইতে হইলে তাই শুধু দিল্লীতে নহে সমগ্র স্থানেই জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান একান্ত জরুরি।

সুভাষিত

চিন্তনীয়া হি বিপদাম্ আদাবেব প্রতিক্রিয়া।
ন কূপখননং যুক্তং প্রদীপ্তে বহ্নিনা গৃহে।। —পঞ্চতন্ত্র

বিপদ সম্পর্কে আগে থেকে সাবধানতা রাখা প্রয়োজন, ঘরে আগুন লাগার পরে কুয়ো খুঁড়লে লাভ হয় না।

তৃণমূলের লাল পার্টির জন্য সংরক্ষিত দাওয়াই এখন রুগি পাল্টে বিজেপি'কে দেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২০১৪ সালের চলতি বছরে পুলিশ দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী তৃণমূল বিজেপি-র মধ্যে সংঘর্ষের সংখ্যা এক লাফে ১০ গুণ বেড়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শাসক ও বিরোধী যুযুধান দু' পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ একটা রুটিন বিষয় ছিল বামফ্রন্ট আমল থেকেই। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পরেও জেলায় শহরে এই সশস্ত্র লড়াই মূলত চলতো তৃণমূল ও সিপিএম-এর মধ্যেই। কিন্তু ২০১৪-র লোকসভা ভোটের ঘোষণা ও ফলাফল প্রকাশের পর থেকে এই রাজনৈতিক শত্রু চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে শাসকদল বিজেপি-কে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নিয়ে আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে পাওয়া আরও খবর অনুযায়ী ২০১২ সালে তৃণমূল- বিজেপি সংঘর্ষের সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ১৩টি, পরের ২০১৩ সালেই তা বেড়ে হয় ৪৮টি। আর চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে দু'দলের হানাহানির সংখ্যা পৌঁছেছে ১৯৬টিতে। বিজেপি-র পক্ষে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৫০ জনকে, আহত হয়েছেন ২৫০ জন। ২০১২ সালের তুলনায় এই সংখ্যা ১০ গুণেরও বেশি। প্রসঙ্গত সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের সংঘর্ষের সংখ্যা ২০১৩ সালে ছিল ১৯১৬। এ বছর এখন পর্যন্ত তা ৮০২।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, গ্রামে গঞ্জে যেখানে মূলত বরাবরের শত্রু সিপিএম বা কংগ্রেসেই ছিল এই আক্রমণের নিশানা, যে জায়গায় প্রথম সাত মাসে গড়ে দিনে একটি করে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ প্রমাণ করছে সিপিএম বা কংগ্রেস তাদের নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা অনেকটাই খুইয়েছে। গ্রামে তাদের সমর্থনের ভাঁড়ারে এখন ভাটার টান। এর কারণ অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে অপসৃতমান সিপিএম সমর্থকদের শূন্যস্থান পূরণ করতে বিপুল উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। সত্যি সত্যিই এ রাজ্যে তারা ওভার টাইম খাটছে। কেন্দ্রের ২৭২$^{+}$ এর সফল লক্ষ্যকে পুঁজি করে ২০১৬-র নির্বাচনে তারা লক্ষ্য রেখেছে মিশন ১৫০$^{+}$ (রাজ্যের আসন সংখ্যা ২৯৪)। আজকের তারিখে বিধানসভায় তাদের কোনো সদস্য না থাকলেও দলের উদ্দীপনার একটা কারণ হলো গত লোকসভা ভোটে ২১টি বিধানসভা কেন্দ্রে দলের প্রথমস্থানে থাকা।

এই সঙ্কল্পের যথার্থতা বোঝাতে রাজ্য বিজেপি-র আয়োজনে গত ২৪ তারিখেই কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী মন্ত্রী অরুণ জেটলি। অনুমান করা যাচ্ছে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আরও বহু রথী মহারথীর আনাগোনায় ব্যস্ত থাকবে রাজ্য দপ্তর। সংবাদে প্রকাশ, সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই দলীয় অধ্যক্ষ অমিত শাহ তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করতে পারেন। ওই সময় তিনি একটি দলীয় কর্মী সম্মেলন ছাড়াও কলকাতায় আলাদা জনসভাও করবেন। বিজেপি-র এই রাজনৈতিক তৎপরতাই যে শাসক দলের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে সংঘর্ষগুলির রাজ্যওয়ারি পরিসংখ্যান দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। (১) বাঁকুড়ায় ২৪, (২) কোচবিহারে ২৩, (৩) বর্ধমান ২০, (৪) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ২০, (৫) পশ্চিম মেদিনীপুর ও জঙ্গলমহলে ১৭, (৬) হুগলী ১৬, (৭) পূর্ব মেদিনীপুরে ১০, (৮) নদীয়া ৮, (৯) জলপাইগুড়ি ৪। এই সংখ্যাগুলি সবই থানায় নথিভুক্ত। এর বাইরেও হানাহানি চলছেই। এই বাড়বৃদ্ধির ডিএনএ পরীক্ষা করলে আবার একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। ২০১৪ সালের ভোটের বৃদ্ধির সঙ্গে সংঘর্ষ বৃদ্ধির একটি সমান্তরাল যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সংঘর্ষের পরিসংখ্যান বাঁকুড়া প্রথম স্থান পেয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে বিষ্ণুপুর লোকসভার আওতায় থাকা বাঁকুড়া কেন্দ্রে বিজেপি-র ভোট ৪ শতাংশ থেকে ৫ গুণেরও বেশি বেড়ে ২১ শতাংশ হয়েছিল। আবার কোচবিহারে ভোট শতাংশ এক লাফে ৬ থেকে প্রায় ১৮ শতাংশে পৌঁছে যায়। সংঘর্ষে জেলার স্থান দ্বিতীয়। অন্যদিকে হুগলী জেলার দু'টি আসন শ্রীরামপুর ও হুগলীতে বিজেপি এবারে ভোট ২২ ও ২৩ শতাংশ পেয়েছে যা ২০০৯ সালে ছিল মাত্র ৫ শতাংশ। প্রসঙ্গত যে বীরভূমে ১৬ মে ফলাফল ঘোষণার পরই প্রথম বিজেপি সমর্থক খুন হয় সেখানে ৪.৮ শতাংশ থেকে বিজেপি-র ভোট বৃদ্ধি ছিল নজরকাড়া ১৮ শতাংশ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য অনুযায়ী বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সম্বলিত জঙ্গলমহলে জনসমর্থন হারানো সিপিএম দলের পরিত্যক্ত পার্টি অফিসগুলিতেই বিজেপি অফিস গড়ে উঠেছে। তৃণমূল স্তরে কাজ করা গরিষ্ঠসংখ্যক বামকর্মীরাই বর্তমানে বিজেপি-তে যোগ দিচ্ছেন।

জেলায় জেলায় সিপিএমের সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষ অব্যাহত থাকলেও তৃণমূলের এই বিজেপিকে তেড়েফুঁড়ে টার্গেট করার একটা কারণ ভোট বৃদ্ধি ছাড়াও নানান ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে। বাঁকুড়ার তৃণমূল সভাপতির মত অনুযায়ী বিজেপি জেলায় প্রভাব বিস্তারের মরিয়া চেষ্টা করছে। অন্যদিকে কুচবিহারে হিংসাত্মক সংঘর্ষ বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে সেখানকার তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, লোকসভা ভোটের পর ফরওয়ার্ডব্লক ও সিপিএম থেকে দলে দলে সমর্থক বিজেপিতে ভিড়তে থাকে। এরাই অনেক জায়গায় মারদাঙ্গায় অংশ নিচ্ছে।

পরিস্থিতির সর্বাঙ্গীণ পর্যালোচনা করে পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিংহ জানাচ্ছেন, সংঘর্ষের যে সরকারি সংখ্যাগুলি মিডিয়ায় উঠে আসছে বাস্তবে তার সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁর মত অনুযায়ী তৃণমূলের পক্ষে হিংস্র আক্রমণের মূল কারণ দলনেত্রী মমতার বিজেপি-ভীতি। পরিতাপের সঙ্গে শ্রী সিং বলেন, অধিকাংশ সংঘর্ষই পরিচালিত হচ্ছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। সারা বাংলার জেলায় জেলায় বিজেপি সমর্থনের পাল্লা ভারী হতে দেখে আতঙ্কিত শাসকদল সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে। যাতে ভয়ে লোক বিজেপি ছেড়ে শাসক দলের কেনা তাঁবেদার হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের নয়া রাজ্যপালকে নিয়ে চিন্তায় শাসক শিবির

দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ॥ পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হয়ে এসেছেন বিজেপি-র প্রবীণ নেতা তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা স্পিকার কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরই কংগ্রেস আমলে নিযুক্ত প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান এম কে নারায়ণনকে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। চাপে পড়ে নারায়ণন সরে যাওয়ার পর লক্ষ্ণৌ থেকে উড়িয়ে আনা হয় কেশরীনাথ ত্রিপাঠীকে। বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রথমে ঠিক করেন যে, লালজী ট্যান্ডনকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো হবে। লালজী রাজি না হওয়ায়, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংকে রাজ্যপাল করার ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। কল্যাণ সিং নিজে উত্তরপ্রদেশ ছাড়তে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কেশরীনাথ ত্রিপাঠীকে পাঠানো হয় কলকাতায়। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে চান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে, এ বিষয়ে রাজ্যপাল নিশ্চিত থাকতে পারেন। কিন্তু সূত্রের খবর যে, রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এরই মধ্যে দিল্লি গিয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন। তারপরও রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে গোপন রিপোর্ট গেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপালকে নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন মমতা শিবির। কেন্দ্র এই মুহূর্তে যে পশ্চিমবঙ্গের মমতা প্রশাসন বা তৃণমূল শিবিরের সঙ্গে সংঘাতের রাস্তায় যাবে না সে ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেস শিবির নিশ্চিত হলেও ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে ২০১৫ সাল থেকে যে কেন্দ্র-বিজেপি চাপ বাড়াবে তার চিন্তা রয়েছে তৃণমূল শিবিরে। একইভাবে ইউপিএ আমলে নিযুক্ত প্রাক্তন রাজ্যপাল এস কে নারায়ণনকে নিয়ে কোনো দিনই স্বস্তিতে ছিলেন না সিপিএম নেতৃত্ব। সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণনের সম্পর্ক কোনোদিনই মধুর ছিল না। ভারত-মার্কিন

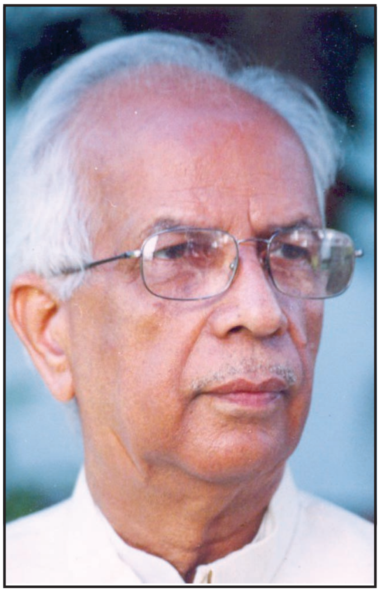

রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী

অসামরিক পরমাণুচুক্তি রূপায়ণের ক্ষেত্রে গান্ধী-নেহরু পরিবারের প্রতি অনুগত এই প্রাক্তন আইপিএস অফিসারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ছিলেন প্রকাশ কারাত বাহিনী। এছাড়া নারায়ণনকে কমিউনিস্ট বিদ্বেষী বলেও মনে করা হোত। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চীন কীভাবে ভারতের বিরুদ্ধে নানা ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছে, এমনকী পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতকে নানাভাবে বেগ দেবার চেষ্টা করেছে তা নিয়ে এম কে নারায়ণন দেশে জাতীয় উপদেষ্টা হিসেবে একাধিকবার প্রকাশ্যে তাঁর মত ব্যক্ত করেছিলেন। এন এসএ-র কমপিউটার থেকে চীন হ্যাকিং করেছে— এমন অভিযোগ তুলে এম কে নারায়ণন দেশ জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মত স্পর্শকাতর রাজ্যে তাঁর রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের পেছনে ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছিলেন সিপিএম নেতৃত্ব, বিশেষ করে যখন ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের আগে তাঁকে এই রাজ্যে আনা হয়। এই সময়ে রাজ্যপালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। একজন কমিউনিস্ট বিদ্বেষী, গান্ধী-নেহরু পরিবারের প্রতি অনুগত এই প্রাক্তন আইপিএস অফিসার সম্পর্কে দলের অভ্যন্তরে প্রকাশ কারাতরা কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তখনও মনমোহন সিং তথা কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী সম্পর্কে নরম হওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিয়োগ নিয়ে কড়া অবস্থান গ্রহণ করেননি। এ নিয়ে দলের অনেক কেন্দ্রীয় নেতা বিস্ময়ও প্রকাশ করেছিলেন। অন্যদিকে, বুদ্ধদেবের রণকৌশল ছিল সেই মুহূর্তে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিপিএম বিরোধিতার হাতিয়ারকে জোরদার না করা। যদিও এ নিয়ে সিপিএমের অভ্যন্তরে বিরোধ থাকলেও তা প্রকাশ্যে আনা হয়নি।

বিরোধী রাজনৈতিক মহল মনে করছেন যে, এম কে নারায়ণন রাজ্যপাল হওয়ায় সিপিএম ২০১১ সালে নির্বাচনের আগে আরও বেকায়দায় পড়ে যায়। সিপিএম যেমন প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান এম কে নারায়ণনের নিয়োগে চিন্তায় ছিলেন, ঠিক একইভাবে এখন নারায়ণকে হটিয়ে কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর মতো কড়া ধাঁচের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে পশ্চিমবঙ্গে আনায় চিন্তায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

ভারতীয় মুসলমানদের নিয়ে বিদেশের মাটিতে গঠিত প্রথম জঙ্গি গোষ্ঠীর 'মাতৃভূমি'তে জেহাদের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের এক ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত হয়ে ভারতে বসবাসকারী এক মুসলমানের কণ্ঠে জেহাদের ডাক মিলল এবার। ৩৯ বছর বয়সী ওই মুসলমান যুবক সুলতান আবদুল কাদির আর্মার উত্তর কর্ণাটকের ভাটকলের এক ছোটো ব্যবসায়ীর ছেলে বলে জানা গিয়েছে। লক্ষ্ণৌ-এর দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলেমায় তার ইসলামিক শিক্ষার পাঠ বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। গত জুলাই মাসের শেষের দিকে তাকে দেখা গিয়েছিল আনসার উল তাওহিদ অনলাইনে। ডিজিটালগত ভাবে মুখোশ পরা এক যুবক যার বাঁদিকে ছিল একটি ল্যাপটপ, ডানদিকে কোরান এবং সামনের ডেস্কে অত্যন্ত দামি ও আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। সেই যুবকটির কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল : 'আমার আদরের ভাইয়েরা, আল্লার দৃষ্টির সামনে তোমাদের ওপর কী ঘটছে তা সবাই দেখছে। তোমরা অসহায় শিশুদের, মহিলাদের এবং বয়স্কদের জন্য লড়াই করতে পারছ না। তারা কী তাদের উদ্ধারের জন্য প্রভুর কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করবে। সুতরাং ওঠ— আহমেদ শাহ আবদালি এবং মহম্মদ এবেনকোয়াসিমের মতো। ওঠ সৈয়দ আহমেদের মতো, নবি আর তার সহযোগী মাতৃভূমির সেবকদের মতো। এক হাতে কোরান নাও, অন্য হাতে তলোয়ার ধরো এবং জেহাদের ক্ষেত্রে প্রবেশ করো।' তখন আর্মারের পরিচয় জানা না গেলেও পরে তার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়। একদা ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের অন্যতম রিক্রুটার এই মুসলমান যুবক তার জঙ্গি সংগঠনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পাকিস্তানে তেহরিক-ই-তালিবানের এক শিবিরে যোগ দেয়। যেখানে অন্তত ডজনখানেকের বেশি ভারতীয় জেহাদি ছিল বলে খবর। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের এক সন্দেহভাজনকে যে আর্মারকে খুব ভালভাবে চিনত তাকে জেরা করে ওই কণ্ঠ যে তারই তা নিশ্চিত হন গোয়েন্দারা। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন আনসার উল তাওহিদের মূল মস্তিষ্ক হলো এই আবদুল কাদির আর্মার। তাঁরা বলছেন, ভারতীয় জেহাদিদের নিয়ে বিদেশের মাটিতে গঠিত এটাই প্রথম জঙ্গিগোষ্ঠী। কোনো ইসলামিক রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়ে সেখানকার কোনো কট্টর গোষ্ঠীর মদতে ভারতে জেহাদের কাজকর্ম চালানো। আপাতত সিরিয়ায় আশ্রয় নিয়ে আনসার উল তাওহিদ ভারতে সন্ত্রাসী কাজকর্ম চালানোর ছক কষছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর।

কোনো হিন্দু জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে না কেন? প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা-র ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসী জোট সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের মন্ত্রী শ্যামলাল শর্মা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উদযাপনের অনুষ্ঠানে ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, "জম্মু থেকে নির্বাচিত কোনো হিন্দু কখনই জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে না— এমন কথা কি দেশের সংবিধানে লেখা আছে?" জম্মুর আখনুরে যুব কংগ্রেস আয়োজিত এক জনসভায় তিনি এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। শ্রী শর্মার এই ন্যায়সঙ্গত বক্তব্যে উপত্যকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রে তৎকালীন মাত্র ২ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতা এ আর আন্তুলে অবলীলায় সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই একই মানদণ্ডে একজন হিন্দু কেন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জম্মু- কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না তিনি এর সদুত্তর প্রত্যাশা করেন। শ্রী শর্মা তাঁর বক্তব্যের জোরালো করতে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম ও ড. মনমোহন সিং-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, দেশের জনসংখ্যার ১২ শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায় ও মাত্র ২ শতাংশ শিখ সম্প্রদায়ের হলেও ড. কালাম দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদাধিকারী হয়েছিলেন। আর ড. সিং-তো ১০ বছর দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল ছিলেন। এই ঐতিহাসিক পরম্পরার সম্প্রসারণ করে কেন আমরা কাশ্মীর উপত্যকায় একজন হিন্দুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে পারব না! তাঁর বক্তব্যের সুর আরও চড়িয়ে শর্মা জনতার উদ্দেশে বলেন, তাঁরা কি কখনও এই বিষয়টা ভেবে দেখেছেন? অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে শর্মা জানান, হিন্দুরা কোনোদিনই মুসলমান আধিপত্যের বিরোধিতা করেনি, তাই এই পরিস্থিতি চিরস্থায়ীভাবে টিকে রয়েছে। হিন্দুরা কেবলই নির্জীব ভেড়ার পালের মতো কাশ্মীরি নেতাদের হুকুম তামিল করে চললে তাদের বরাতে আরও দুঃখ লেখা আছে। এ প্রসঙ্গে তিনি গোটা রাজ্যে কৃষি প্রযুক্তিবিদদের নিয়োগের সূত্রে বলেন, কেবল মাত্র উপত্যকার লোকজনই নিযুক্তিপত্র পেয়েছে, জম্মুর কারুরই ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। জম্মু আজ বেকারদের রাজধানী হয়ে উঠেছে।

তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে শর্মা সবশেষে একটি মোক্ষম তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যের সচিবালয়ের মোট কর্মীর সংখ্যা সাত হাজার যার মধ্যে হিন্দু কর্মীর সংখ্যা অতি নগণ্য। মাত্র দুই শতাংশ। এই অনাচার আর কতদিন চলতে পারে বলে তিনি চরম বিস্ময় প্রকাশ করেন।

তামিলনাড়ুতে একের পর এক হিন্দুনেতা হত্যায় অভিযুক্ত আল উম্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১২-র ১২ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ছ'টি অতি গুরুতর ঘটনা-সহ অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। যেখানে হিন্দুত্ববাদী নেতারা বারে বারে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে নিহত হয়েছেন দু'জন। তামিলনাড়ুর বুকে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার তদন্তে নেমে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক পুলিশ জেনেছে এর পেছনে জঙ্গিগোষ্ঠী আল উম্মার যোগ রয়েছে। তাদের সন্দেহের তির জঙ্গি নেতা আবু বাকের সিদ্দিকির দিকে। দু'টি পৃথক ঘটনায় ভেলোর, রামানাথপুরম, সালেম, মাদুরাই ও চেন্নাইতে ছ'জন হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রাণ হারিয়েছেন (সারণি দ্রষ্টব্য)। প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুর বুকে কট্টর জঙ্গি কার্যকলাপ চালানোর জন্য আল উম্মা কুখ্যাত। বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পর এই জঙ্গি সংগঠনটির জন্ম। ১৯৯৮ সালে কোয়েম্বাটোরে যে বোমা বিস্ফোরণে ৫৮ জন নিরীহ নাগরিকের মৃত্যু হয় তার পেছনে আল উম্মার সক্রিয় হাত ছিল। প্রথম পাঁচটি হত্যার জন্য তামিলনাড়ু পুলিশের সিবি সি আই ডি শাখা যে তিনজনের নামে চার্জশিট দাখিল করে তার প্রত্যেকের আল উম্মার সক্রিয় সদস্য বলে পরিচিত। এরা হলো পুলিশ ফকিরুদ্দিন (বাবা পুলিশকর্মী হওয়ার কারণে এর ডাকনাম পুলিশ হয়েছে), পান্না ইসমাইল ওবিলাল মালিক, এদের বয়স ছাব্বিশ থেকে উনচল্লিশের মধ্যে।

গত বছরের অক্টোবরে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে চেন্নাই ও চিত্তোরের নিকটবর্তী পুত্তুর থেকে তারা ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। সাম্প্রতিক ও ষষ্ঠ হত্যায় অভিযুক্ত দু'টি চব্বিশ বছরের যুবক মহম্মদ সামেস এবং সৈয়দ আলি নওয়াজকে গত ১৮ জুন চেন্নাই থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তামিলনাড়ুতে আল উম্মার হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করার অভিযোগ এদের বিরুদ্ধে বহুদিনের। এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে যে সমস্ত ঘটনা সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে বেছে বেছে বিজেপি আর এস এস বা সঙ্ঘ- সমমনোভাবাপন্ন নেতাদেরই টার্গেট করা হচ্ছে। এই অতি বিপজ্জনক প্রবণতা এখনই রুখতে না পারলে ভবিষ্যতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি হবে বলে আশঙ্কায় রাজ্য প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা।

গত বছরের ১৯ জুলাই বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভি রমেশ ওরফে অডিটর রমেশ প্রাণ হারান সালেমে একটি নৃশংস ঘটনায়। এর পরেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জে জয়ললিতা সিবি-সি আই ডি তদন্তের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনাটিকে আপাতভাবে স্থানীয় বলে মনে হলেও সিবি-সি আই ডি তদন্তের পরে ঘটনার অন্য চিত্র পাওয়া যায়। তবে এর সঙ্গে জড়িত হওয়ার অপরাধে এদেরকে গ্রেপ্তার করলেও মূল চক্রী হিসেবে পুলিশ খুঁজছে আবু বাকের সিদ্দিকি-কে। ৫০ বছরের এই আড়ালে থাকা জঙ্গিটি ইংরেজি সাহিত্যে ডক্টরেট। রাজ্যে অসংখ্য খুনের ঘটনায় জড়িত ও ব্যাঙ্গালোরে বিজেপি কার্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণের মূলপাণ্ডা এই জঙ্গিটি পুলিশের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় রয়েছে সেই ১৯৯৫ সাল থেকেই।

সারণি

অক্টোবর, '১২ থেকে নিহত ৬, খুনের চেষ্টা অসংখ্য

অক্টোবর ২০১২ **ভেল্লোর :** বিজেপি-র চিকিৎসক শাখার সম্পাদক ড. ভি অরবিন্দ রেড্ডি।	**জুলাই ২০১৩** **ভেল্লোর :** হিন্দু মুন্নানির রাজ্য সম্পাদক এস ভেল্লাইয়াপ্পান।
মার্চ ২০১৩ **রামনাথপুরম :** বিজেপি-র প্রাক্তন কাউন্সিলার কে মুরুগান।	**জুলাই ২০১৩** **সালেম :** বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভি রমেশ ওরফে অডিটর রমেশ।
জুন ২০১৩ **মাদুরাই :** হিন্দু মুন্নানি নেতা পলকারা সুরেশ কুমার।	**জুন ২০১৪** **চেন্নাই :** হিন্দু মুন্নানির তিরুভাল্লুভারের জেলা সভাপতি কে পি সুরেশ কুমার।

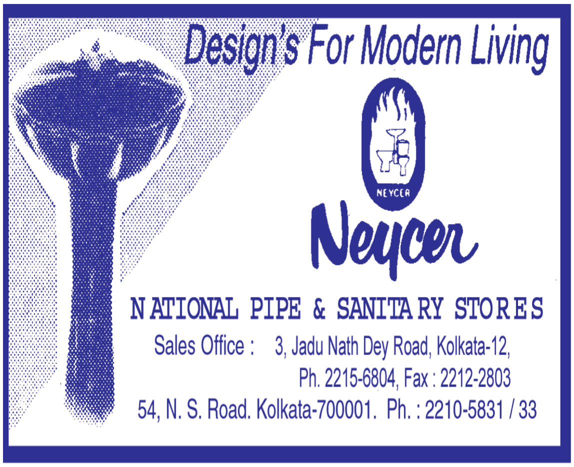

ইজরায়েলকে দেখে শিক্ষা নিতে হবে

জঙ্গিদের সঙ্গে কোনো আপোস নয়

গূঢ়পুরুষের কলম

হ্যাঁ, ইজরায়েলকে দেখে ভারতবাসীর শিক্ষা নেওয়া উচিত। ইজরায়েল একটা ছোট রাষ্ট্র। ভারতের মতো বিশাল উপমহাদেশ নয়। ইজরায়েলকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রয়েছে কট্টর মৌলবাদী ইসলামি রাষ্ট্রজোট। প্যালেস্তাইনের জেহাদি গোষ্ঠী হামাস নিত্য হামলা চালাচ্ছে। আর প্রতিটি হামলার কড়া জবাব দিচ্ছে ইজরায়েল। মারের জবাবে পাল্টা মার। ভারতের সংবাদমাধ্যম জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের সমর্থনে লাগাতার প্রচার চালাচ্ছে। কাঁদুনি গাইছে। ইজরায়েলকে খলনায়ক প্রমাণ করতে খবরের কাগজে পাতাজোড়া প্রবন্ধ ছাপছে। কিন্তু ইজরায়েলকে দেখুন। তার দেশের নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার লক্ষ্যে অবিচল। ইউ এন ও, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স কাউকেই সাহায্যের জন্য ডাকছে না। আপন শক্তি ও সামরিক ক্ষমতার উপর আস্থা রেখে অসম লড়াই একাই লড়ছে। আমেরিকা একদা ইসলামি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। পরে পাকিস্তানে লুকিয়ে থাকা আল কায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে গুপ্ত হত্যার পর সেই ঘোষণা বেবাক ভুলে গেছে। শুধু একা সপ্তরথী বেষ্টিত হয়ে ইজরায়েল জেহাদি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ইজরায়েল জানে যে জঙ্গিরা শান্তির ললিত বাণী শোনে না। একমাত্র শক্তির ভাষা বোঝে। তাই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সদর্পে ঘোষণা করতে পারেন, 'হামাসের জেহাদিরা যদি একজন ইজরায়েলের নাগরিককে হত্যা করে তবে আমরা সাতজন জেহাদির মাথা কেটে প্রতিশোধ নেব।' বিশ্বের দ্বিতীয় কোনও রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক এমন কথা প্রকাশ্যে বলার সাহস দেখাননি।

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকারীদের মদত দিলে ভারত সরকার উপযুক্ত জবাব দেবে। শুধু বার্তাই নয়। ২৫ আগস্ট ইসলামাবাদে ভারত ও পাকিস্তানের বিদেশ সচিবদের নির্ধারিত বৈঠকও বাতিল করেছেন মোদীজী। তিনি ভারতের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ, দিল্লীতে পাকিস্তানের হাইকমিশনার আবদুল বাসিত কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গীদের নেতা সারির শাহ, সইদ আলি শাহ গিলানি, মিরওয়াইজ উমর ফারুখ এবং ইয়াসিন মালিকের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন। বৈঠকে পাক হাইকমিশনার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভারতের বিরুদ্ধে 'ছায়া যুদ্ধ' চালাতে সবরকম মদত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপরেও কীভাবে দুই রাষ্ট্রের বিদেশ সচিবদের বৈঠক হতে পারে। ১৯ আগস্ট পাক হাইকমিশনার কাশ্মিরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। আর তার সাতদিনের মধ্যে বিদেশ সচিবদের নির্ধারিত বৈঠক ছিল। আসলে পাক সরকার ভারতকে বন্ধু হিসেবে পেতে চায় না। এরপরেও যদি ভারত বন্ধু হিসেবে হাত বাড়ায় তবে তাকে কাপুরুষতা ছাড়া দ্বিতীয় কিছু বলা যেত না। মোদীজী সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের নীতি অনুসরণ করেছেন। নেহরুর পঞ্চশীল নীতি নয়। মোদীজী জানেন যে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শক্তের ভক্ত। পাকিস্তানের তুলনায় ভারত অনেক বেশি শক্তিধর রাষ্ট্র। এই সহজ সরল কথাটি আমেরিকাকে বুঝতে হবে। ইউ এন ও-র পর্যবেক্ষকরা গত ৫০ বছর ধরে ভারত সরকারের অতিথি হয়ে শ্রীনগরে পাকাপাকিভাবে বসে থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন করে চলেছে তা এবার বন্ধ করতে হবে। ইজরায়েলকে দেখে আমাদের শিখতে হবে। রাষ্ট্রের স্বার্থে ইজরায়েল আমেরিকা, ইউ এন ও কাউকে পরোয়া করে না। ইসলামি জঙ্গি দমনে কোনো আপোস করে না। মোদীজীর সাহসী পদক্ষেপ ভারতের মুসলমান দরদি সেকুলার বুদ্ধিজীবী এবং বামপন্থী সাংবাদিকদের পছন্দ হচ্ছে না। তারা প্রচার করছে যে নভেম্বর মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা ভোটের আগে হিন্দু ভোটদাতাদের জোটবদ্ধ করতেই পাকিস্তানের সঙ্গে বৈরী আচরণ করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এ এক অদ্ভুত কুযুক্তি। যে কোনো নির্বাচনেই সব রাজনৈতিক দল জিততে চায়। এর মধ্যে দোষের কী আছে! মনে রাখতে হবে, সাম্প্রতিক লোকসভার নির্বাচনে জম্মু ও কাশ্মীরের মোট ৬টি আসনের ৩টিতে বিপুল ভোটে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থীরা। এই তিনটি আসন হচ্ছে— জম্মু, লাদাখ এবং উধমপুর। এর মধ্যে উধমপুর আসনে নবাগত বিজেপি প্রার্থী জীতেন্দ্র সিং কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী গুলাম নবি আজাদকে ৬০,০০০ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেছিলেন। ভুললে চলবে না যে বিজেপি-র জেতা ৩টি লোকসভা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত আছে ৪১টি বিধানসভা কেন্দ্র। জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার মোট আসন ৮৭টি। মাত্র ৩টি অতিরিক্ত আসন পেলেই জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যাবে। তাই বিধানসভার নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করতে চাওয়াটাকে বিদ্রুপ করে লাভ নেই। অন্য একটি কথাও মনে রাখতে হবে। ২০১৪-র লোকসভার নির্বাচনের আগে বিজেপি-র ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে কাশ্মীরকে দেশের অন্য রাজ্য থেকে পৃথক করতে সংবিধানের ৩৭০ ধারা জারি করেছিল কংগ্রেস সরকার। সেই ধারা বিলোপ করে কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে গণ্য করা হবে। কিন্তু কাশ্মীরে ক্ষমতাসীন দল ন্যাশানাল কনফারেন্স এবং বিরোধী দল পিডিপি যুক্তভাবে বিজেপি-র নীতির বিরোধিতা করছে। তাই জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার নির্বাচনে জেতাটা বিজেপি-র কাছে বিশেষ জরুরি। সংবিধানের ৩৭০ ধারাটি জম্মুতে হিন্দুদের এবং লাদাখে বৌদ্ধদের ইসলামি অত্যাচারের শিকার করেছে। এই ধারাটি না থাকলে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে হিন্দু পণ্ডিত সমাজকে সমূলে উৎখাত করতে পারতো না বিচ্ছিন্নতাবাদী জেহাদিরা। বিধানসভার নির্বাচনের আগে হিন্দু পণ্ডিতদের নিজ বাসভূমিতে বসবাসের অধিকার দিতে হবে। হ্যাঁ, আবার সেই কথাটি বলছি। ইজরায়েলকে দেখে ভারতের হিন্দুদের শিক্ষা নিতে হবে। জঙ্গি নাশকতার সঙ্গে কোনো আপোস নয়। শক্তিমানকে সবাই শ্রদ্ধা করে। মার খেয়ে কাঁদুনি গেয়ে শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না।

সিঙ্গাপুরে পাগলু ডান্স 'থোড়া সা কর লে রোমান্স'

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

দিদি, সিঙ্গাপুর বেড়িয়ে এলেন। আমার জন্য কিছুই আনলেন না। সত্যি এটা ভালো হলো না। রাজ্যের জন্য কিছুই আনতে পারেননি কিন্তু আমার মতো একনিষ্ঠ ভাইটার জন্য একটা মেমেন্টো টাইপের কিছু কি আনতে পারতেন না?

যাইহোক, আনতে না পারলেও দিয়ে তো এসেছেন। হাত খালি করে দিয়েছেন। তুলাইপাঞ্জি চাল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার, কলকাতায় রাস্তার নাম, গোছা গোছা প্রতিশ্রুতি অনেক কিছুই দিয়েছেন।

আমি সিঙ্গাপুর না গেলেও আপনার বন্ধু-খবরের কাগজ আর টিভি চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে সবই জানতে পেরেছি। ওখানে আপনি কাকে কী বললেন, কী কী করলেন সবই জানতে পেরেছি। আপনার শত্রু চ্যানেল আর খবরের কাগজ গুলোর কথা মোটেই শুনিনি। বরং চোখ কান বুজে ছিলাম। দিদি কেমন পাখি দেখলেন? রাজারহাটেও শুনছি ওইরকম পাখিরালয় বানাবেন। বেশ হবে দিদি সামনের বছর ওখানে পিকনিক করতে যাব।

সিঙ্গাপুরের আসরে আপনার বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছিল আপনি যেন পঞ্চায়েত ভোটের জনসভা করছেন। দারুণ মজা লাগছিল। আপনি রাজ্যের লজ্জার কথা ওখানে গিয়ে রাষ্ট্র করে দিয়েছেন। বেশ করেছেন। ৩৪ বছর ধরে বামফ্রন্ট যে রাজ্যের ভাঁড়ার শূন্য করে দিয়েছে সেটা সব্বার জানা দরকার। এমনিতেও জানে। তবু আপনার মুখ থেকে শোনার একটা আলাদা মানে আছে। কিন্তু দিদি, মুশকিল হচ্ছে আজকাল আর কোনো খবরই চেপে রাখা যায় না। সিঙ্গাপুরওয়ালারাও জেনে গেছে এই রাজ্যে শিল্প করা মুশকিলের। তোলা শিল্পের সঙ্গে কম্পিটিশন যে সোজা নয়, সেটা ওরাও জানে। তাই তো ওদের বিদেশমন্ত্রী কে ষণ্মুগম যে চাহিদা তালিকা দিয়েছেন তাতে রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ চেয়েছেন। একলপ্তে ভালো জমি চেয়েছেন। দলের জনসভায় যা বলেন, আপনার সেই বিখ্যাত ডায়লগ— 'জমি কোনো সমস্যা নয়' সেটাও বলেছেন। রাজ্যের অলীক ল্যান্ডব্যাঙ্কের গল্পও বলে দিয়েছেন। তবে ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি যে 'ল্যান্ডব্যাঙ্ক' ব্যাপারটা পুরোটাই গল্প। ওরা ভাবছে ব্যাঙ্কের ভল্টে জমি পোরা আছে। কিন্তু অ্যাকাউন্ট যে টি টি সেটা ওরা জানবে কী করে?

কিন্তু দিদি আপনি যে বললেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নামে একটা চেয়ার হবে সেটা কী করে সম্ভব? আপনি কি ওটাও গুল দিয়েছেন? কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে তো যার তার নামে চেয়ার করা যায় না। তাছাড়া আমাদের শিক্ষায় তাঁর অবদানই বা কী সেটাও তো ভাবতে হবে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কার নামে চেয়ার হবে সেটা তো তাদের ভাবার বিষয়। স্বশাসিত সংস্থার ওপর সরকার তো ইচ্ছে বা খুশি চাপিয়ে দিতে পারে না। তবে আপনি পারবেন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হোক আর পাঠশালা আপনি তো সবেরই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী। এছাড়াও শিল্প হলে কলকাতায় তাদের নামে একটা রাস্তা করে দেবেন বলেও আপনি ঘোষণা করে দিয়েছেন। দিদি, আমি কখনও সিঙ্গাপুরে যাইনি। ওদের চিনি জানিও না। বলছি, ওরা কি খুব নামের কাঙাল? একটা রাস্তার নামের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে দেবে? তোলাবাজদের ভয় পাবে না? কারখানার গেটে তালার ভয় পাবে না?

তবে দিদি সিঙ্গাপুর শুনছি বেশ কিছু পজেটিভ জিনিস দেখেছে আপনার মধ্যে। প্রথমত আপনার যে গুণগ্রাহী দল আপনাকে গোটা ট্যুরে সঙ্গ দিয়েছে তাদের দেখে ওদেশের শিল্পপতি থেকে সরকার সবার চোখ ঘুরে গেছে। ভাবছে বাবাঃ এত মিডিয়া বশংবদ? এত সাংবাদিক জো হুজুর, জো দিদি করে? এত শিল্পপতি আপনার পাশে ঘুরঘুর করে? কয়লা মাফিয়া থেকে সিনেমা মাফিয়া সবাই আছে আপনার দলে? অশ্বত্থ পাতার মতো আপনার ভিজিটিং কার্ডটার ক্রিয়েটিভিটি দেখে সবার চোখ গোল গোল। আর সেরাটা হচ্ছে সিঙ্গাপুরে পাগলু ডান্স।

সত্যি দিদি, আপনার সেরা আবিষ্কার এই দীপক অধিকারী। যেদিন ব্রিগেডের শহীদ মঞ্চে ওকে দিয়ে পাগলু নাচালেন সেদিন কে ভেবেছিল একদিন সেই হয়ে উঠবে এ রাজ্যের শিল্পদূত! 'পাগলু থোড়া সা কর লে রোমান্স' গানে মেতে উঠেছে আজ বঙ্গ রাজনীতি। এখন তো টালিগঞ্জের পাগলু ভায়া ঘাটাল লোকসভার পাগলু। এবার সিঙ্গাপুরও দেখল দেব মহিমা।

ভালো থাকবেন দিদি। দেব দাকে আমার প্রণাম জানাবেন।

— সুন্দর মৌলিক

দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্যে বাংলা টলমল

সুমিত মিত্র

'What Bengal thinks today India thinks tomorrow'— মহামতি গোখলের এই আপ্তবাক্য আজ এক অভিশাপ বলে প্রতিভাত হচ্ছে। অনেকেই শিউরে উঠছেন বাংলার পরিস্থিতি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনুসৃত হলে সেদিন কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে।

সচারাচর অনেকেই বলে থাকেন বাংলার এক গৌরবময় অতীত রয়েছে, কিন্তু আজকের বাংলা নিতান্তই পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত। কিন্তু এমনটা ঘটল কি করে? নানা মুনির নানা মত। তবে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভাবক হিসেবে দুটি দানবীয় শক্তির উল্লেখে সকলেই একমত। সে দুটি হলো প্রথম পর্বে সিপিএম ও চলতি অধ্যায়ে মমতা দেবী। কিন্তু সামাজিক শক্তি বিন্যাসের কোন তারতম্যে এঁরা এমনভাবে রাজ্যের ইতিহাস নিয়ন্তা হয়ে উঠলেন?

প্রথমেই বলা দরকার এই গৌরবজ্জ্বল অতীত কথাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পূর্বতন ইংরেজ শাসকের বাণিজ্য প্রচেষ্টা। ইংরেজ মালিকানায় নানান কলকারখানায় ভরা ছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বাংলা। এই তথ্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে দুটি কঠিন সত্য। (১) বাংলা ছিল একটি গরিব রাজ্য। কিন্তু ঔপনিবেশিক বাংলায় তুলনামূলক বেশি মাথাপিছু আয় সম্ভব হয়েছিল ইউরোপীয়দের বহু কাজ-কারবার বাংলাতেই পত্তন হওয়ার সুবাদে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেইমাত্র এই ইউরোপীয় পুঁজি পাততাড়ি গোটাল (বিশেষ করে ১৯৭৩ সালে ইন্দিরা গান্ধীর বিদেশি বিনিয়োগের ওপর বিধিনিষেধের আইন কানুন জারি হওয়ার সূত্রে) সেই সময় যে ভারতীয় পুঁজিপতিরা ইউরোপীয়দের ছেড়ে যাওয়া কারবারগুলির মালিক হলেন (পূর্বের অংশীদারি সূত্রে)। তারা কিন্তু বুঝতে পারছিলেন তাদের না আছে বাড়তি পুঁজির সংস্থান না আছে ফেলে যাওয়া ব্যবসাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ধৈর্য।

ভারতীয় মালিকদের কাজকর্ম ও রাজ্য সরকার :

পরিস্থিতির উন্নতি সাধনের কোনো চেষ্টা তো নব্য মালিকরা করলেই না উল্টে চালু জুটমিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার যে সম্পদ ছিল তা শুষে নিয়ে সেগুলির অধিকাংশকেই শিল্পের শ্মশানভূমি বানাতে দেরি করলেন না।

এই সময় তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির সুবাদে কিছু কিছু পাবলিক সেক্টর প্রকল্পকে বাংলায় নিয়ে আসেন। কিন্তু এগুলিতে যে সংখ্যায় চাকরি তৈরি হচ্ছিল তা প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছিল হু হু করে, সঙ্গে যোগ হয়েছিল ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৩-এর মধ্যে আসা ৬০ লক্ষ বাংলাদেশী শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী।

একথা ঠিকই বাংলার কৃষককুল কঠিন পরিশ্রমী। কিন্তু অন্যান্য কিছু পেশার কাজ যেমন সাফাইকর্মী, মালবাহক এগুলিকে বাঙালি অস্পৃশ্য বলেই মনে করত। মধ্যবিত্ত বাঙালি অফিসের কেরানিগিরি বা কারখানার কাজকেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনায় রাখত। কিন্তু ১৯৭০ সাল নাগাদ এগুলি প্রায় শুকিয়ে যায়। কর্পোরেট মালিকানায় নতুন কিছু আর বাংলার তৈরি হওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।

জনসংখ্যা ও উদ্বাস্তু আগমন :

বাংলার অধোগমনের পথটিকে আরও মসৃণ করে তোলে রাজ্যের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও অবিরাম উদ্বাস্তু আগমন। ভারতবর্ষে প্রতি কিলোমিটারে ১০০০ লোকের বসতি ধরলে বাংলায় তা এর আড়াই গুণ অর্থাৎ আড়াই হাজার। এই অবস্থায় ১৯৭৭ সালে সিপিএম সরকারে বসে ভেবেছিল সকলকেই অল্প অল্প জমি দিলে হয়ত এই হতাশাজনক পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যাবে। বামপন্থীদের 'প্রয়োজন ভিত্তিক' তত্ত্বের ভিত্তিতে পরীক্ষামূলক এই প্রচেষ্টা ১ দশকের মধ্যেই চূড়ান্ত অসার বলে পরিগণিত হয়। সেই অপারেশন বর্গার সুফলভোগীরা আদতে পেয়েছিল রুমাল পরিমাণ জমি যা তাদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়। পরিণতিতে তারাও চাকরি প্রার্থী হয়ে ফিরে আসে।

বামপন্থী শাসন :

দীর্ঘ সময়কাল থেকে বাংলার শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে একটা জিনিস খুব সফলভাবে বামপন্থীরা করতে পেরেছিল তা বাঙালি মানসে একটা প্রতিবাদের নেতিবাচক জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া। সেই ১৯৫০ সাল থেকে নজর করলে দেখা যাবে বাঙালিরা প্রতিবাদে ক্লান্তিহীন। তার কিছু একটা হলেই হলো। সে এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়াই হোক আর ভিয়েতনামের যুদ্ধই হোক। প্রতিবাদে বাঙালি বুঝে না বুঝে এক পায়ে খাড়া। আর এই নিরন্তর প্রতিবাদ চর্চার ফলে প্রতিবাদ নামক অস্ত্রটি কালক্রমে ভোঁতা হয়ে পড়ে। এই সুযোগে প্রতিবাদের রাশ টেনে নেয় দুর্বৃত্তবাহিনী। কুখ্যাত সমাজবিরোধীরা হয়ে উঠতে থাকে প্রতিবাদী নেতা। এই অধঃপতন পর্বে বেসরকারি মালিকরা মাঝে মধ্যে এখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতি সম্পর্কে কানাঘুষো অনুসন্ধান করতেন। কিন্তু নিচের তলায় প্রবলভাবে সক্রিয় থাকা সিপিএম দুর্বৃত্তরা প্রতিটা ছুঁতোনাতায় তাদের কাছে বখরা চাইত। যে কোনো নগণ্য লগ্নী প্রচেষ্টাকেই এই কাটমানি চক্রের ব্যূহ ভেদ করে তবেই এগোতে হোত। এরই অন্তিম

ক্লাইম্যাক্সে ছোট-বড় সব রকমের বিনিয়োগকারী বাংলাকে পরিত্যাগ করে। এ রাজ্য শিল্পোদ্যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

২০০০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কিন্তু সেই অর্থে ব্যক্তি-মালিকানার প্রচেষ্টায় কোনো মার্কসবাদী শুচিবাই ছিল না। বেসরকারি উদ্যোগে চাকরি তৈরি হলে তিনি গররাজি ছিলেন না।

এই সন্ধিক্ষণেই যখন বুদ্ধদেববাবু কলকাতা থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরত্বে সিঙ্গুরে টাটার কারখানা তৈরি করতে তাঁর দলের একবগ্গা ছুঁৎমার্গীদের বোঝাতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই নীচু তলার গুণ্ডাবাহিনী বুঝে যায় সামনে ঝামেলা আসছে। তড়িঘড়ি তারা ইতিমধ্যেই অরাজকতা সৃষ্টিতে স্বনামধন্য হওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেছে। ইনি প্রথমে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার ও পরে এনডিএ জোট সরকারকে জ্বালিয়ে 'আমার আমার' প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এই বিধ্বংসী প্রতিবাদী দলে সিপিএম-এর গুণ্ডারা নাম লেখাতে দেরি করেনি। তারা দেওয়াল লিখন পড়ে ফেলেছিল। এই নেত্রীর ধ্বংসাত্মক প্রতিবাদের অংশ হিসেবে দীর্ঘ সময় জাতীয় হাইওয়ে প্রকল্পটি গর্ভাবস্থায় বিনষ্ট হয়। ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক মন্দা আরও গভীর হতে থাকায় বিক্ষুব্ধ মানুষের স্বাভাবিক আক্রোশ শাসক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ব্যর্থতার ওপর গিয়ে পড়ে। ২০১১ সালে সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাইটার্সের দখল নেন মমতা। কিন্তু প্রতিবাদের সংস্কৃতি যেমন ছিল তেমনই চলতে থাকে। চাকরির বাজার হতে থাকে আরও সঙ্কুচিত।

মমতা পর্ব :

সিপিএম-এর তৈরি বিনা পরিশ্রমে টাকা রোজগারের অর্থাৎ তোলাবাজির যে শিল্প বাংলায় জাঁকিয়ে বসেছিল তার রমরমা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমান বাংলায় একটি ঘর করুন কি কারখানা বা একটি ইট গাঁথতে গেলেই আপনাকে সিন্ডিকেট রাজের মস্তানদের খপ্পরে পড়তে হবে। হয় তাকে থোক টাকা দিতে হবে নয়ত তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী বেশি দামে কিনতে হবে।

অনেকেই শুনে থাকবেন আসানসোলের 'শ্যাম সেল পাওয়ার' নামক কোম্পানিতে দৈনিক যে পরিমাণ মাল খালাস হয় তার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপর তোলা না দিলে সেখানকার ম্যানেজারকে খুন করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী আবার ওই কেন্দ্রেরই লোক। তিনি দোষীর পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেছেন আসলে ওই ব্যক্তি অনেকটা রবিনহুড ধরনের, গ্রামের গরিবরা তো চাকরি পাচ্ছে না তাই তোলার কিছুটা তাদেরও দেয়। পুলিশ এই ভয়ঙ্কর মারণ হুমকিদারের বিরুদ্ধে একটি লঘু দায়সারা এফ আই আর করেছে। যাতে সে অনায়াসে জামিন পেয়ে যেতে পারে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে এই একই গল্পের পুনরাবৃত্তি। রাজ্যবাসী শুনে আঁতকে উঠবেন তথাকথিত উন্নয়নের ঢক্কানিনাদের প্রেক্ষাপটে গত ৩ বছরে ৯০টি বড় কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে ২৬টি জুট মিল ও ২৮টি চা-বাগান। হাওড়া ব্রিজ রঙ করার বিরল গৌরবের অধিকারী প্রাচীন শালিমার পেন্টে কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। এমনকী তুলনামূলকভাবে নবীন Nokia-Sicmens-এর যৌথ শিল্পদ্যোগও উঠে গেছে। এমন পোড়া জায়গায় কে আর বুক ঠুকে শিল্প করতে আসবে। এই ডামাডোলের বাজারে শুধু তথাকথিত লুম্পেন প্রলিটারিয়েটদেরই সমাজের ওপর কব্জা বজ্রকঠিন হচ্ছে।

অথচ বাংলার একটু বাইরে গেলেই দেখা যাবে সেখানে গিয়ে বাঙালিরা চমৎকার কাজ করছেন। কারণ সেখানে গুণ্ডাদের রক্তচক্ষু নেই। ইস্কুল, কলেজ, থানা, পুলিশ সব প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের অত্যাচারের মুখে পড়তে হয় না। এখন আবার বিনোদন ক্ষেত্রেও এই গুণ্ডাবাহিনীর দাপাদাপি শুরু হয়েছে। তাপস পাল নামে একটি নিম্নরুচির চলচ্চিত্র অভিনেতা যিনি আবার নেত্রীর দয়ায় সাংসদও বটে। তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের মহিলা বিরোধীদের সব ঘরে বন্ধ করে গুণ্ডাদের দিয়ে ধর্ষণ করিয়ে খুন করে দেওয়ার কুৎসিৎতম হুমকি দিয়েও দিব্যি চরে বেড়াচ্ছেন। মানুষের তীব্র বিক্ষোভেও পুলিশ অন্ধের ভূমিকা নিয়ে চলছে। বীতশ্রদ্ধ নাগরিকদের মধ্যে কেউ আদালতে ওই গুণ্ডা সাংসদের গ্রেপ্তার চেয়ে মামলা করলে সরকার সাংসদের পক্ষে চড়া পারিশ্রমিকের সরকারি উকিল লাগিয়ে ডিভিসন বেঞ্চে আপিল করেছে। বহু প্রবীণ আইনজীবী বিস্ময় প্রকাশ করে বলছেন, এ কোন রাজ্যে তাঁরা বাস করছেন। সাংসদের ঘৃণ্য ভাষণ বারবার বৈদ্যুতিন চ্যানেলগুলিতে কোটি কোটি রাজ্যবাসী শুনেছে।

এমন একটা ন্যায়-নীতিহীন রাজত্বের প্রতিচ্ছবি যদি মহামতি গোখলের দূরদৃষ্টিকে সফল করে হিন্দুস্থানের অন্য কোনো রাজ্যে ফুটে ওঠে তা যে এক নির্মম অভিশাপই হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে বুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালিরা দেশের অন্য রাজ্যে আশ্রয় খুঁজে নিতে পারেন বা দেশের বাইরেও চলে যেতে পারেন। সে সুযোগ আছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করা এই রোগ যদি গোখলের বাণীকে সত্য করে বাকি হিন্দুস্থানে ছড়াতে থাকে তাহলে কোটি কোটি দেশবাসীর পালাবার কি কোনো জায়গা থাকবে? মিথ্যে হোক মহামতি গোখলের ভবিষ্যদ্বাণী— এই রাজ্যবাসীর প্রার্থনা।

(সৌজন্যে টাইমস অফ ইন্ডিয়া)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

ভারতীয় কৃষির পুনর্গঠন

ড. রঘুবংশমণি পাণ্ডে

কৃষিকাজ হলো কৃষকের শিল্পনৈপুণ্য। কৃষকের সে বিষয়ে জ্ঞান ভারতীয় সভ্যতার অভিন্ন অঙ্গ। বৈদিক যুগের সংস্কৃতি ও সভ্যতা কৃষিভিত্তিক ও কৃষিকেন্দ্রিক ছিল। এর প্রমাণ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, বায়ুর দেবতা মরুৎকে প্রার্থনার হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে বিদ্যমান। এছাড়া বরুণ, মিত্রবরুণ, পর্জন্য আদি দেবতারও স্তব অনেক সূক্তে আছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে বৈদিক আর্যসভ্যতা নিঃসন্দেহে কৃষিভিত্তিক ছিল। ঋগ্বেদের কৃষিসূক্ত সরাসরি কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। অক্ষসূক্তে কৃষির মহত্ত্ব বর্ণনা এবং মাণ্ডুক্যসূক্ত কৃষিকাজে ব্যাঙ-এর মহিমা গুণগান করা হয়েছে। কেননা ব্যাঙ বর্ষাকালের আগমনবার্তা ঘোষণা করে।

কৃষিবিজ্ঞান বিকাশের উল্লেখ ৪০০ খৃস্টপূর্বে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং ৬০০ খৃস্টাব্দে বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় পাওয়া যায়। এসব গ্রন্থে কৃষি সম্পর্কিত সাহিত্য বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়েছে। ৬০০-৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দে পাণিনি এবং ২০০ খৃস্টপূর্বাব্দে পতঞ্জলির গ্রন্থসমূহে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক নিয়মের মধ্যে কৃষি ও কৃষক সম্পর্কিত উদাহরণ আছে। অভিধান রত্নমালা, নামলিঙ্গানুশাসন, মনসোল্লাস, বীরমিত্রোদয়, শিবতত্ত্ব রত্নাকর এবং শুক্রনীতিতেও কৃষিবিষয়ক তথ্যের অনেক বর্ণনা আছে। 'কৃষি শাসন' কৃষিকাজ সম্পর্কিত বিষয়ের সঙ্কলন এবং 'কৃষিশাস্ত্র'-এ কৃষিকাজের উপযুক্ত সময় এবং অন্য বহুবিধ গতিবিধির সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ উপকরণেরও বর্ণনা আছে। মহর্ষি কশ্যপের কৃষি সূক্তিতেও খুব সুন্দর ভাবে কৃষিকাজের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে কৃষিকে এক বৃহৎ আঙ্গিকের দৃষ্টিতে দেখা হোত। সে সময় তাকে 'বার্তা' বলা হোত। তখন পশুপালন ও বাণিজ্য কৃষির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখনো পশুপালনকে কৃষিকাজেরই অংশ মনে করা হয়। পশুপালনও একটি বিজ্ঞান, এর অন্তর্গত গৃহপালিত পশুপক্ষী পালন ও সংবর্ধন খুব গুরুত্ব সহকারে করা হোত। এসব বর্ণনা পরাশর সংহিতার 'বাহন বিধানম্' অধ্যায়ে অতি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ আছে।

বাণিজ্যের মধ্যে ব্যবসা ও অর্থ দুই-ই ছিল। কৃষির সহায়ক বিজ্ঞান রূপে বাণিজ্যকে মনে করা হোত। কেননা কৃষিকাজের ফলে উৎপাদিত পণ্যই বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ছিল। উন্নত কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত এরকম অনেক বিষয় পরাশর সূক্তে অনেকবার বর্ণনা করা হয়েছে। পরে ধীরে ধীরে বাণিজ্যের অন্যান্য দিক বিকশিত হওয়ায় তার আধিপত্য ও ব্যবস্থা প্রশাসন আশ্রিত হয়ে পড়ে। দেশকে সমৃদ্ধশালী করার দায়িত্ব প্রশাসনে এসে পড়ে। ফলে কৃষি ও বাণিজ্য আলাদা হয়ে যায়।

মহাভারতে মহর্ষি ব্যাস বলেছেন, এই দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ এজন্যই যে তা উন্নত কৃষির উপর দাঁড়িয়ে আছে। পতঞ্জলি বলেছেন, এদেশ এজন্যই সমৃদ্ধ যে এখানকার মানুষ কৃষিকাজ ও পশুপালন খুবই যত্নের সঙ্গে করেন। আমরা জানি, কৃষি বিজ্ঞান আমাদের দেশে জ্ঞানের একটি বড় শাখারূপে দেখা হোত। প্রাচীন ভারতে কৌটিল্যেরও আগে কৃষিকে অর্থাগমের

প্রধান উৎস বলে মনে করা হোত এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতির মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। প্রাচীন ভারতে পরাশর, গর্গ ও কশ্যপের মতো মহান জ্ঞানী ও দার্শনিকরা কৃষিকাজকে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করার কথা বলেছেন। এই তিনজন ছাড়া অন্য ঋষিগণও কৃষি বিজ্ঞানকে উন্নত করেছেন।

কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'কৃষিপরাশর'-এ বর্ষা পূর্বানুমান বিষয়ে অনেক তথ্যের বর্ণনা আছে। এছাড়া কৃষিকাজের সাধারণ নিয়ম, চাষের জন্য লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি এবং চাষের নানাবিধ নিয়মের বর্ণনাও আছে। বীজ সংরক্ষণ, জমি কর্ষণ, বীজতলা তৈরি করা, বীজের অঙ্কুরোদ্গম করা, বপন করা, জলসেচ, নিড়ানো এবং চারাগাছের সুরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ফসল কাটা, ঝাড়াই, গোলাজাত করা ইত্যাদির বহুবিধ উল্লেখ আছে।

সুরপালের 'বৃক্ষ আয়ুর্বেদ'-এ গাছের গুরুত্ব, তার লাভ-ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে কতদূরে ও কোন দিকে লাগাতে হবে তার বিস্তৃত উল্লেখ আছে। এছাড়া, মাটি, গাছ লাগানোর পদ্ধতি, বড় করা, গাছের রোগ, বাগান তৈরির পদ্ধতি, ভুগর্ভের জলস্তর, কূপ নির্মাণ ইত্যাদির বিষয়েও বর্ণনা আছে।

বর্তমান পরিদৃশ্য :

ইংরেজদের আগে ভারতীয় কৃষিকাজের একটি পদ্ধতি ছিল। এটা কেবলমাত্র অর্থাগমের উপায় ছিল না। মূল উদ্দেশ্য ছিল জীবনের মৌলিক আবশ্যকতাগুলি পূরণ করা। স্বাভাবিকভাবেই কৃষিকাজ প্রাকৃতিক ছিল এবং গ্রাম ও কৃষককে সমস্ত দিক থেকে সক্ষম রাখতো। ইংরেজ কৃষি ও বন-নীতির পরিবর্তন করে কৃষিকাজের ওপর কর চাপিয়ে দেয়। এর জন্য তারা কৃষকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। কৃষককে চা, কফি, পাট, কার্পাস ও নীল চাষে বাধ্য করে। কেননা ইংরেজদের ব্যবসার এগুলিই ছিল কাঁচামাল। এভাবেই ভারতীয় কৃষির স্বাবলম্বী স্বরূপ ধ্বংস হয়ে যায় এবং আধুনিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে তাকে একটি উপাঙ্গরূপে রাখা হয়েছে মাত্র।

স্বাধীনতার দু' দশকের মধ্যেই 'সবুজ বিপ্লব'-এর নামে পারম্পরিক ভারতীয় কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। নতুন রকমের সঙ্কর বীজ, রাসায়নিক সার, বিষাক্ত রাসায়নিক কীটনাশক, ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্রপাতি এবং সেচের জন্য বিদ্যুৎ ও ডিজেলভিত্তিক উপকরণ ব্যবহারে কৃষিকাজ পূর্ণরূপে বাজার নির্ভর হয়ে পড়ে। সবুজ বিপ্লবের সময় যন্ত্রপাতির ব্যবহার দেশের কিছু অংশে শুরু করা হলেও বেশির ভাগ অংশে তার অচ্ছুত ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সারা দেশেই এর প্রভাব পড়তে শুরু করে। এর ফলস্বরূপ পারম্পরিক পদ্ধতি, জ্ঞান ও উপকরণ ব্যবহার হ্রাস পেতে শুরু করে। ফলে দেশের কৃষি বিকাশের হার কমতে শুরু করে। সবচেয়ে খারাপ ও ভয়ানক প্রভাব পড়ে বীজের ওপর। হাজার হাজার বছর ধরে বিকশিত হওয়া এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যেও অনুকূল থাকা হাজার হাজার প্রজাতির বীজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সে জায়গায় কয়েক বছরের গবেষণায় প্রস্তুত অধিক ফলনশীল বীজ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এগুলি সবসময় রোগ ও কীটপতঙ্গের আক্রমণের মধ্যেই থাকে এবং অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের কারণেও মাটি খারাপ হয়ে যায়। বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বন্ধুকীট ও জীবাণু একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। ট্রাক্টর ব্যবহারের জন্য বলদ কসাইখানায় বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা। গো-সম্পদ ধ্বংস হওয়ার কারণে গোবর ও গোমূত্রের মতো জৈব সারের অভাব হচ্ছে। গো-পালন কেবল মাত্র দুধের জন্য হওয়ায় শহরের লোকেরাই তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। পয়সার লোভে কৃষক নিজের জন্য না রেখে পুরোটাই বিক্রি করে দিচ্ছেন। এর ফলে গ্রামের মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে।

পারম্পরিক ভারতীয় কৃষি পূর্ণমাত্রায় বদল করে যে 'সবুজ বিপ্লব' করা হয়েছিল, মাত্র চার দশকের মধ্যেই তার সবুজত্ব নষ্ট হয়ে যায়। সোনালি ভারতের সোনালি কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস করে দিয়ে সরকার কৃষকদের আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। সবুজ বিপ্লবের অগ্রণী রাজ্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশে বিষাক্ত কীটনাশক প্রয়োগের কারণে ভয়ঙ্কর রোগ--- যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ, মানসিক রোগ, শারীরিক বিকৃতি, অন্ধত্ব ও দুরারোগ্য চর্মরোগ মহামারীর আকার ধারণ করে। ৫০ বছরেরও কম সময় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটি, জল ও বাতাস দূষিত করে পুরো পরিবেশটাই আমরা নষ্ট করে ফেলেছি।

এই আধুনিক কৃষির দ্বিতীয় দুষ্পরিণাম হলো এর বাজারিকরণ হওয়া। সার, বীজ, ওষুধের জন্য পুরোমাত্রায় কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষক তার স্বাবলম্বিতা হারিয়ে ফেলেছে এবং ঋণজালে ফেঁসে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের কথা, দেশের কৃষিমহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য কৃষি গবেষণা সংস্থাগুলিও এই আধুনিক কৃষির প্রচার ও প্রসার করাকেই প্রধান উদ্দেশ্য করেছে। আজ এই সংস্থাগুলির কাছে বিকল্প কৃষির কোনো রূপরেখা নেই। এই অবস্থায় কৃষকদের আত্মহত্যা, মাটি দূষণ ও উর্বরতা হ্রাস, উৎপাদন হ্রাস, শস্যের গুণমান হ্রাস, বাস্তুতন্ত্র নষ্ট এবং কৃষকদের দিনদিন গরিব হয়ে যাওয়া এক ভয়ানক পরিস্থিতির সূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এজন্য এক নতুন ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যার দ্বারা উপরোক্ত সমস্ত প্রকার অসঙ্গতির সমাধান সম্ভব হতে পারে। কৃষিজ্ঞান, কারিগরী এবং পরিকাঠামোর নতুন সন্ধান যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের সমৃদ্ধির ভিত্তি হতে পারে, আর এটা নিতান্ত আবশ্যক। পূর্ব-বর্ণিত প্রাচীন ভারতীয় কৃষিজ্ঞান, কারিগরী এবং বিভিন্ন পদ্ধতি ও নিয়ম এক দিশানির্দেশরূপে আগামীদিনে পরিবর্তনের পথ দেখাতে পারে। যার দ্বারা স্বাবলম্বী ও সমৃদ্ধ কৃষির পুনর্গঠন সম্ভব হতে পারে।

ভারতীয় কৃষির পুনর্গঠনের জন্য কিছু ভাবনা :

□ নতুন কৃষি কারিগরী জ্ঞান ও পদ্ধতির অনুসন্ধান।

□ দূষণমুক্ত পরিবেশ নির্মাণের জন্য আবশ্যক পদক্ষেপ।

□ বাস্তুতন্ত্র টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার।

□ সমস্তরকম বিষাক্ত রসায়নিকমুক্ত কৃষি।

□ 'কৃষি গৌঃ বাণিজ্যম্'-এর আধারে পূর্ণ রোজগারের রূপরেখা তৈরি করা।

□ কৃষিকে এক সম্মানজনক, লাভজনক ও স্বাবলম্বী স্বরূপ প্রদান করা। কৃষিজাত উৎপাদনে গুণমান ও স্বাদে গুণগত পরিবর্তন আনা।

□ কৃষকের সঙ্গে সারা সমাজকে প্রসন্ন, সুস্থ ও সমৃদ্ধ করা।

□ নতুন কৃষিসংস্কৃতি বিকাশ, যাতে ভারতীয় সংস্কৃতি পুষ্ট, পল্লবিত ও সংবর্ধিত হতে পারে। ■

ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ—একটি পরিচয়

অজিত কুমার বারিক

উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্বে অসম থেকে পশ্চিমে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ভু-ভাগ আমাদের প্রিয় পুণ্যভূমি ভারত। বিধাতার অনন্য সৃষ্টি এই দেশ। অনন্ত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও বিশালতায় এই দেশ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এখানে ছয়লক্ষের অধিক গ্রামে কোটি কোটি কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের বাস, যা দেশের মোট জনসংখ্যা ৭০ শতাংশ। পৃথিবীর সকল দেশের মিলিত কৃষিযোগ্য ভূমির মোট পরিমাণ ১০ শতাংশ। সেই তুলনায় ভারতের কৃষিযোগ্য ভূমি মোট ৫২ শতাংশ। এই কারণে ভারত গ্রাম প্রধান ও কৃষি প্রধান রূপে গড়ে উঠেছে। ঋকবেদে অক্ষদেবন সূক্তে দেশের প্রাচীন কৃষির গৌরবের কথা বলা হয়েছে— অক্ষৌ মা ! দিব্যঃ ! কৃষিমিৎ কৃষস্ব। বিত্তে রমস্য বহুমন্যমানঃ।। অর্থাৎ জুয়া খেল না, কৃষিকাজই করো। এই থেকে লাভজনক প্রাপ্তধনে বহু সম্মানপূর্বক বেঁচে থাকো।

কৃষক সমাজ নিরলস ঘাম ও রক্ত ঝরিয়ে নিরন্তর পরিশ্রমে উৎপাদন করে দেশে খাদ্য ভাণ্ডারগুলি ভরে তোলে। তবুও কৃষককে শোষণ, পীড়ন, অত্যাচারিত হতে হয় সকল সময়। কখনো সে উৎপাদনের লাভজনক মূল্য পায় না। যার কারণে আর্থিকভাবে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে কৃষক। এই আর্থিক দুরবস্থার জন্য সরকারি কৃষিনীতি যেমন দায়ী তেমনি আরও বেশি দায়ী গণতান্ত্রিক দেশে কৃষকদের সারা দেশব্যাপী নিজস্ব কোনো শক্তিশালী সংগঠন না থাকা। এই কারণে কৃষক সকল সময় অসহায় ও উপেক্ষিত। এইরূপ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেশের প্রখর জাতীয়তাবাদী চিন্তক ও দার্শনিক শ্রদ্ধেয় দত্তপন্থ ঠেংড়ী সমস্ত দেশ ভ্রমণ করে কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্ক করেন এবং ১৯৭৯ সালের ৪ মার্চ রাজস্থানের কোটা শহরে প্রায় দেড় হাজার কৃষক প্রতিনিধির সম্মেলনে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ কৃষকদের, কৃষকদের জন্য, কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত অরাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী কৃষক সংগঠন। ১৯৭৯ সালের ৪ মার্চের এই দিনটি ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। কারণ স্থাপনের সময় থেকেই অসম থেকে গুজরাট, কেরল থেকে জম্মু-কাশ্মীর পর্যন্ত সকল প্রান্তে বিস্তার লাভে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে

প্রায় ৪৫০টি জেলায় দেশব্যাপী একমাত্র বিশাল সংগঠন ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ।

ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের কৃষক পরিভাষা— বহুদূর বিস্তৃত ধরা হয়েছে। আমরা মানি যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকর্মে যুক্ত সমস্ত লোক, কৃষিকাজে সহযোগী সকল শ্রমিক— বাড়ুই, লোহার, কামার, কুমার এবং অন্য সকল কারিগর এবং গ্রামে বসবাস করে সকলেই কিষান সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সকলেই কৃষক। এই সকল কৃষক ভাই ও ভগ্নিনী আমাদের সদস্যভুক্ত হতে পারে। বর্তমানে ১০ টাকার প্রায় ২২ লক্ষ সদস্য রয়েছেন। আগামী ২০১৫ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ জনগণকে সদস্য করার জন্য সংগঠনের অখিল ভারতীয় অধ্যক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

সংগঠনের কাজের জন্য তিনটি পদ্ধতি— যথা সংগঠনাত্মক, আন্দোলনাত্মক ও রচনাত্মক। ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ সদস্যতার আধারে গ্রাম সমিতি, গ্রাম সমিতির আধারে ব্লক সমিতি এবং তার উপরে জেলা সমিতি ও প্রদেশ সমিতি গঠন করে। সারা দেশে বর্তমানে প্রায় এক লক্ষ্য গ্রাম সমিতি আছে। গণতন্ত্রের রচনাত্মক কাজে সংগঠনের আধারে সমাজকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের অধিকার প্রাপ্তির জন্য সংঘর্ষ এবং সম্পূর্ণ গ্রাম বিকাশের মাধ্যমে দেশের উন্নতি করা। ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ একটি জনসংগঠন হওয়ায় এই তিন পদ্ধতিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সমস্ত কৃষক এবং গ্রামীণ সমাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ।

রীতি নীতির দিক থেকে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ হলো কার্যকর্তা ভিত্তিক। নির্বাচন এবং দলীয় রাজনীতি হতে দূরে থেকে পারিবারিক স্নেহ ভাবনা এবং কর্তব্যে বিশ্বাসী সংগঠন। নেতার জয়ধ্বনি নয়, ভারত মাতা ও কৃষি দেবতা বলরামের জয়ধ্বনি দিয়ে থাকে। সর্ব প্রথম দেশমাতার জয়ধ্বনি করে— ব্যক্তি বা সংগঠনের নয়।

কৃষিকাজ মানব জীবন রক্ষার একমাত্র সর্বোত্তম উপায়। বিজ্ঞানের উন্নতি এবং অন্য বিকাশ ছাড়াও উদর পূর্তির জন্য খাদ্য শস্য উৎপাদনও মাটিতে করা হয়। এছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। এই দৃষ্টিতে চিন্তা করলে মনে হবে যে এতে কৃষির উপকার হয় মানে কৃষকদের উপকার হয় না। কৃষি মনুষ্য জীবন রক্ষার এক অনিবার্য কর্তব্য এবং দায়িত্ব। কৃষির উৎপাদন কারখানার উৎপাদনের মতো আট গুণ বাড়ানো যায় না। মাটিতে কি পরিমাণ সার, জল দিলে এক নিশ্চিত পরিমাণে উৎপাদন বাড়তে পারে —আন্তরিক ভাবে জানতে হবে। অন্য কাজের সঙ্গে কৃষি কাজের তুলনা নয়। সর্ব প্রথম আন্তরিক হতে হবে কৃষিযোগ্য উর্বর ভূমি রক্ষা করতে।

এই প্রধান বিষয় মনে রেখে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে লাগাতার কাজ করে চলেছে। কৃষক সুখী হলে দেশ সুখী হবে, গ্রাম সম্পন্ন হবে, তবেই দেশ সমর্থ হবে---এটাই আমাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা। ■

কৃষি ও কৃষককে বাঁচাতে জৈবিক চাষের দ্রুত প্রয়োজন

নগেন্দ্রনাথ বর্মন

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। যুগ যুগ ধরে দেশে প্রাকৃতিক ও জৈবিক ভাবেই কৃষিকাজ করে কৃষক জীবিকা নির্বাহ করত। কেন্দ্র সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নতির লক্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যোজনা তৈরি করে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী (৭১-৭৫) পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে সবুজ বিপ্লব ঘটানোর নাম করে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার শুরু করে। কৃষক অধিক পরিমাণে ফসল ফলানোর আশায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে শুরু করে। আরো অধিক ফসল পাওয়ার আশায় অধিক পরিমাণে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে শুরু করে। আজ অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরাশক্তি কমে যাচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, ভূগর্ভস্থ জলস্তর নিচে নেমে যাচ্ছে, মাটির জলধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, ফসলের পুষ্টিগুণ কমে গেছে। ফলে মানুষ নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বর্তমানে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও উচ্চ ফলনশীল বীজ-এর দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ফসলের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। সেই তুলনায় উৎপাদিত ফসলের দাম না পাওয়ায় কৃষক ঋণগ্রস্ত হচ্ছে। এই ভাবে চাষ করে কৃষকের দিনের পর দিন ঋণের বোঝা বেড়েই যাচ্ছে। ক্ষতিতে চাষ করে কৃষক ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে সংসারের সমস্যা মিটাতে না পারায় মানসিক ভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এই বিষয়ের উপর দীর্ঘ আট বছর (১৯৯৬-২০০৪) ধরে Tata Institute of Social Science (টাটা শোধ সংস্থান) অনুসন্ধান চালিয়ে নির্ণয় করেছে যে সরকার ঘোষিত সহায়ক মূল্যের থেকে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বেশি। যেসব ফসল বিক্রি করে কৃষকের ঘাটতি হচ্ছে— ধান ৩৮ শতাংশ, বাদাম ৩২ শতাংশ, তুলা ৩৮ শতাংশ। আঁখ ১২ শতাংশ, গম ৪৭ শতাংশ, সয়াবীন ৩৭ শতাংশ, ছোলা ৪৭ শতাংশ। মূল কারণ তিনটি— অধিক মূল্যে উচ্চ ফলনশীল বীজ ক্রয়, রাসায়নিক সার ক্রয় ও ফসলকে বাঁচানোর জন্য কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ।

এমতাবস্থায় ঘাটতির হাত থেকে কৃষিকে বাঁচানোর একমাত্র পথ বৈজ্ঞানিক তথা ব্যবহারিক দিক দিয়ে জৈবিক চাষের দ্রুত প্রচলন। এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। জৈবিক সার তৈরি কম খরচেও কম শ্রম দ্বারা সম্ভব। এই চাষে বায়ুমণ্ডল দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং উৎপাদিত ফসল অর্থাৎ শাক-সবজি, ফল খেলে মানুষের শরীর অসুস্থ হওয়ার প্রশ্ন নেই। জৈবিক চাষে ফসলের দাম সবসময় বেশি দামে বিক্রি হয়। জৈবিক সার স্বল্প খরচে পরিশ্রমের দ্বারা কৃষক নিজেই তৈরি করতে পারে। সেদিন আর বেশিদিন বাকি নেই যেমন, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র ইত্যাদি প্রদেশে জৈবিক সার— উৎকৃষ্ট কেঁচো সার, কম্পোস্টসার, শিং-সার ইত্যাদি মাধ্যমে ব্যাপক চাষ শুরু হয়েছে এবং কৃষক লাভবান হচ্ছে। এই ভাবে সামান্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরাও জৈবিক চাষ শুরু করেছে। জলপাইগুড়ি জেলার অধিবাসী লেখক নিজেও কেঁচো সারের মাধ্যমে ওল চাষ করে (এক বৎসরে ১৫-২০ কেজি) লাভবান হয়েছে। প্রতি বৎসর বিভিন্ন গ্রামের কৃষককে জৈবিক কৃষি প্রশিক্ষণ দিয়ে জৈব চাষে উৎসাহিত করা চলছে। অল্প দিনের মধ্যেই বাংলায় জৈব চাষ প্রভাব বিস্তার করবে।

জৈব সার তৈরির কিছু সহজ পদ্ধতি—

সুপার কম্পোস্ট : ১০ ফুট লম্বা ৫ ফুট চওড়া ও ৩ ফুট গভীর একটি গর্ত করে একদিনে যে কোনো সবুজ পাতা, শুকনো আবর্জনা, কলা গাছ, কচুরিপানা, খড় ইত্যাদি গর্তে অর্ধেক ও গোবর অর্ধেক দিয়ে ভর্তি করে মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। তিনমাস পর সার তৈরি হবে। এই সার এক বিঘা জমির পক্ষে যথেষ্ট।

কেঁচো সার : এক মাসে পচানো আবর্জনা সমান মাটিতে গর্ত করে পলিথিন বিছিয়ে তার ওপর সাজিয়ে দিয়ে এক ফুট উচ্চতা করে কেঁচো ছাড়তে হবে। কেঁচো তিন মাসের মধ্যে আবর্জনা খেয়ে সার তৈরি করবে। মাঝে মধ্যে জল দিতে হবে এবং পিঁপড়ার হাত থেকে কেঁচোকে বাঁচাতে হবে। এই সার খুবই উৎকৃষ্ট এবং প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ও অনুখাদ্য পাওয়া যায়।

শিং-সার অনুখাদ্য : এই সার তৈরির উপযুক্ত সময় অক্টোবর মাসের নবরাত্রি থেকে শারদ পূর্ণিমা পর্যন্ত। কারণ এই সার চন্দ্রলোকেই তৈরি হয়। ঠাণ্ডার দিনে সূর্যের তাপ কম থাকায় চন্দ্রশক্তির ক্ষমতা বাড়াতে অনেক সময় পায়। তুলতে হবে ৬ মাস পর অর্থাৎ চৈত্র মাসের নবমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত।

তৈরির পদ্ধতি : সবৎসা গাভীর শিং পাওয়া যায় ভাল, না পেলে যে কোনো শিং-এর ভিতরটা পরিষ্কার করে তা দুধেল গাইয়ের কাঁচা গোবর দিয়ে ভর্তি করুন। মাটিতে গর্ত করে মোটা দিকটা নিচের দিকে রেখে পুঁতে দিন। মাটিকে সামান্য আলগা করে জল দিন। ৬ মাস পর তুলে শিং-এর ভিতরের সার বের করুন। একটি শিং ৩ বার সার তৈরি করতে ব্যবহার করা যায়।

প্রয়োগ : ২ লিটার জলে শিং-সার ভাল করে মিশিয়ে তাতে আবার ১৩ লিটার জল মিশিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই এক একর জমিতে ছিটিয়ে দিন। সন্ধ্যায় শান্ত পরিবেশে এই সার প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়া গোমূত্রের দ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, বীজশোধক অর্থাৎ নীরোগ ও ক্ষমতাশালী বীজ তৈরি এবং কীটরোধক ঔষধ তৈরি করা যায়।

(লেখক প্রদেশ সহ-সভাপতি, ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ)

থাকে যদি
'ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
DUTA
TURMERIC
POWDER
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
CHILLI
POWDER
Kasuri Methi
pure
INDIAN
SPICES
Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

চিঠিপত্র

ইফতার পার্টি ও ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষদের চীৎকার

যুগ যুগ ধরে ভারতে জয়চাঁদের মতো বিশ্বাসঘাতক ও কুলাঙ্গারদের অভাব হয়নি। সমাজে তারা এখনও সমানভাবে সক্রিয়। গত লোকসভা নির্বাচনে তারা বিজেপি-র কাছে গোহারা হেরেও নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ নীতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করেনি। তাই প্রধানমন্ত্রী কাশীতে সন্ধ্যারতি ও বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজা দিলেও একশ্রেণীর ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পায়। তারপর যখন তিনি নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরে পূজা দেন তখন তারা একেবারে খোদ পার্লামেন্টে ফেটে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর এই পূজা দেওয়া নিয়ে আগমার্কা ধর্মনিরপেক্ষ (!) তৃণমূল এমপি সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ও কংগ্রেস এমপি অধীর চৌধুরী ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তাঁদের আরও অভিযোগ যে, মোদী পশুপতিনাথ মন্দিরে পূজা দিলেন অথচ ইফতার পার্টি দিলেন না কেন। এতে নাকি ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে (আনন্দবাজার ৬.৮.১৪)। এইসব তথাকথিত সেকুলার এমপি হিন্দু হয়েও রমজানের পর ইফতার পার্টি দেন— ভাল কথা; এখন তাঁরা জবাব দিন কতজন মুসলমান তাঁদের বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দেন বা কতজন মুসলমান তাঁদের পারিবারিক পূজায় যোগদান করেন। ভণ্ডামির একটা শেষ আছে। আর কেন যে তাঁরা এই ইফতার পার্টি দেন তা খোদ মুসলমান নেতারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন (দি টেলিগ্রাফ ৬.৮.১৪)। তাঁদের এই ইফতার পার্টি দেওয়ায় আসল উদ্দেশ্য মুসলমান ভোট নিশ্চিত করা।

—**সুহাস বসু,**
বেহালা, কলকাতা-৬০।

তারকেশ্বরে তীর্থযাত্রা ও শব্দদূষণ

শ্রাবণ মাসে বাবা তারকনাথের মাথায় পবিত্র গঙ্গাবারি ঢালতে প্রতি বছর অসংখ্য পুণ্যার্থী তারকেশ্বরের উদ্দেশে পাড়ি জমান। ওই পুণ্যার্থীগণের একটি অংশ কালীঘাট বা অন্যান্য স্থানে যেখানে গঙ্গার ঘাট রয়েছে এইরূপ স্থান থেকে পবিত্র গঙ্গাবারি সংগ্রহ করে পদব্রজে তারকনাথ ধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মুখ্য উদ্দেশ্য পবিত্র শিবলিঙ্গ গঙ্গাবারি দ্বারা অভিসিঞ্চিত করা এবং পুণ্যার্জন করা। তাঁরা যাবতীয় শারীরিক যন্ত্রনাকে অগ্রাহ্য-উপেক্ষা করে পুণ্যক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যান। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না তাহল এই যে, উক্ত পুণ্যার্থীগণের বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে বিশ্রামকেন্দ্র তৈরি করেন বিভিন্ন সংগঠন। উদ্দেশ্য মহৎ সে বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হলো, এই যে ওইসব সংগঠনের আয়োজক এবং ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বিশাল বিশাল মিউজিক বক্স লাগিয়ে তারস্বরে গান বাজিয়ে মানুষের কান ঝালাপালা করে দেন। এইসব মিউজিক বক্স থেকে নিঃসৃত গানের বিকট আওয়াজ কোনো শিশু, বৃদ্ধ বা হৃদরোগীর পক্ষে ভীষণ রকমের ক্ষতিকর হতে পারে, আর সাধারণ জনগণের কাছে তা ভয়ানক রকমের বিরক্তিকর।

পথচলতি জনসাধারণ এইসব কুৎসিত শব্দদূষণকে মুখ বুজে সহ্য করেন এবং কোনোপ্রকার ভয়ভীতির কারণে প্রতিবাদ করতে সাহস করেন না। এই শব্দদূষণ পরিবেশের পক্ষেও ক্ষতিকর। পুলিশ, প্রশাসনও এইসব বন্ধ করতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করে না। উক্ত পুণ্যার্থী অর্থাৎ যাঁরা কাঁধে বাঁক নিয়ে চলেন তাঁদের একটি অংশ অত্যন্ত কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করতে করতে, সিটি বাজিয়ে, ড্রাম, ঢোল প্রভৃতি বাজিয়ে এবং অনেক সময় আপত্তিকর শব্দ উচ্চারণ করে আমোদ উপভোগ করেন। এদের অনেকে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে বিভিন্ন প্রকার মাদকের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

ভগবান শিবকে বলা হয়, সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ। আমি জানতে ইচ্ছুক উপরোক্ত কারণগুলি কোন সত্য-শিব-সুন্দরকে প্রকাশ করে? বরং এইগুলি একটি তামসিক পরিবেশের সৃষ্টি করছে এবং হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতির পক্ষে এক নেতিবাচক সঙ্কেত বৃহত্তর সমাজের বুকে প্রেরণ করছে।

আমি এতদ্বারা বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক সংগঠনের নিকট আবেদন রাখতে চাই, তাঁরা এইসব ঘটনার প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ কল্পে এগিয়ে আসুন এবং ধর্মের নামে অধর্মীয় কার্যকলাপকে বন্ধ করতে প্রয়াসী হোন। তা না হলে আগামীদিনে সুস্থ সমাজ গঠনের পক্ষে পরিপন্থী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—**কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়,**
উত্তরপাড়া, হুগলী।

প্যারাটিচারদের দুরবস্থা

পূর্বেকার এনডিএ সরকার সর্বশিক্ষা অভিযান সফল করতে হাজার হাজার ‘শিক্ষাবন্ধু’ (পশ্চিমবঙ্গে পার্শ্ব শিক্ষকসম্প্রদায় বা প্যারাটিচার) নিয়োগ করে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে। বিজ্ঞপ্তিতে এই প্যারাটিচারদের কাজের ফিরিস্তি পরিষ্কার ভাবে ছিল। কিন্তু ‘বিদ্যালয়ের স্বার্থরক্ষা’ নামক ‘বিঃ দ্রঃ’ অনুদেশকে অবলম্বন করে সিনিয়র টিচার, প্রধান শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি এবং কখনো বা প্রশাসনিক আধিকারিকগণ প্যারাটিচারদের উপর অমানবিক আচরণ করেন। যেমন— ক্লাস রুটিন তৈরি করেন এমনভাবে যাতে দিনে

২টি ক্লাস নিতে প্যারাটিচাররা সারাদিন স্কুলে থাকতে বাধ্য হন।

মাঝের অবসর সময়ে পদাধিকার বলে টিচাররা এটা-ওটা করিয়ে নেন। (যদিও হাউসরেন্ট পান, তথাপি) দূর থেকে আসা টিচাররা গরহাজির থাকবেন বলে স্কুলভবনের কাছে থাকা প্যারাটিচারদের উপর দায়িত্বভার দিয়ে থাকেন, পালনীয় দিনে সবার আগে হাজির হওয়ার জন্য। স্কুল স্পোর্টসের সময় মাঠ পরিষ্কার, ট্রাক কাটার দায়িত্ব প্যারাটিচারদের। আর প্রাইজ-টিফিন কেনার দায়িত্ব পান টিচাররা! টু পাইস কামাবার জন্য? পরীক্ষার ডিউটি দিতে দু-এক মিনিট কম বেশির জন্য টিচাররা নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি লাগান। অথচ পাশের রুমেই একটানা নীরবে ডিউটি করছেন প্যারাটিচার। অনুপস্থিত টিচারদের প্রভিশনাল ক্লাস করানো হয় প্যারাটিচারদের দিয়ে। স্কুলের কাজ ছাড়া জনগণনা, ড্রপ আউট স্টুডেন্টস খোঁজা, চাইল্ড রেজিস্টার প্রস্তুত করা প্রভৃতি থাকে, তখন ছুটি পাওয়া মুশকিল। অথচ টিচাররা হামেশা 'হাফলিভ' ভোগ করছেন। প্যারাটিচারদের ক্লাস নেওয়ার এক্তিয়ার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, ক্লাস নিতে হয় নবম, দশম, এমনকী একাদশ-দ্বাদশ অবধি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গার্ড দেওয়ার দায়িত্ব আছে, অথচ স্বাক্ষর করার অধিকার নেই। প্রতিবাদী হলে, হুমকি আসে 'ঠিক আছে অফিসিয়ালি বিপদ আপদ এলে আপনারাই সামলাবেন।'

এবার আসি সরকারি হেনস্থা নিয়ে। গত বাম সরকার বিমাতৃসুলভ আচরণ করে গেছে। প্যারাটিচারের ফান্ড ভেঙে অন্য খাতে দেদার খরচ করেছে। প্যারাটিচারদের উদ্দেশ্যগত কেন্দ্রীয় অর্থ অন্য খাতে বিলিয়েছে। প্যারাটিচারের ভাতার ৩৫ শতাংশ অর্থ রাজ্যের দেওয়ার আইন, অথচ পূর্বতন এবং বর্তমান দুই সরকার এই দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। কিন্তু এস এস সি'র টিচার ভ্যাকান্সি দেখানোর ক্ষেত্রে প্যারাটিচারের সংখ্যা কাউন্ট করা হচ্ছে। অর্থাৎ আর টি ই আইন মানার সময় ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৪০ : ৪ নিয়মের ক্ষেত্রে প্যারাটিচারদের 'ফুল টাইম' চল্লিশ হাজারি শিক্ষক ভাবছে।

তখনকার বিরোধীনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, প্যারাটিচারদের সমস্যা চার ঘণ্টায় উনি সমাধান করে দেবেন। চার বছর হতে চলল। সমস্যাও আছে, মমতা দিদিও আছেন বহাল তবিয়তে। বলা হচ্ছে— টাকা নেই, টাকা নেই। অথচ সাংসদ-বিধায়ক, টিচারদের মাইনা বাড়ছে হরদম। সরকারি আনন্দ অনুষ্ঠান চলছে কোটি টাকা খরচে। কেমন আছেন অন্য রাজ্যের 'শিক্ষকবন্ধু'রা? দিল্লী সহ অন্য কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে তাদের ভাতা প্রায় ১১ হাজার টাকা, বিহারে ৯৫ হাজার টাকা (২০০৯ সালের হিসাবানুসারে) ইত্যাদি। আর বঙ্গের প্যারাটিচাররা পান ৭৭৯৬ টাকা। এই বৈষম্যময় পরিস্থিতিতে মাথা নিচু করে স্কুল করেন প্যারাটিচারেরা। অথচ যোগ্যতা কম নেই কিছু তাদের।

—**বরুণ মণ্ডল,**
রাণাঘাট, নদীয়া।

এক করুণ আবেদন

সংবাদপত্র প্রভাতে খুললেই নজর পড়বে ধর্ষণের ঘটনা। কোথাও বাবা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে কোথাও দাদুর বয়সী কেউ নাতনীকে ধর্ষণ করেছে। এই প্রকার বিকৃতমনস্ক ধর্ষকদের কাছে মেয়ে বা মহিলাদের বয়সের কোনো বাধা নেই। ধরা পড়ার ভয়ে খুন পর্যন্ত করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসাবধানতার জন্য ধরা পড়ছে কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলিহেলনে সেই ধর্ষক আবারও ধর্ষণ করার উৎসাহ পাচ্ছে। ৩৪ বছরের ইতিহাসে কিন্তু এত ধর্ষণ হয়নি। বর্তমানের এর হার যেন জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলেছে। তারপর মহামান্য সাংসদ আবার তাঁর ক্যাডারদের উদ্দেশ্যে রেপ করার যেরূপ উৎসাহ দিয়েছেন তাতে একটা কথাই মনে পড়ে গেল, একটা গেঞ্জি কোম্পানির বিজ্ঞাপন 'নবাব (গেঞ্জি) কিনলে আরাম ফ্রি আর এখন 'তাপস পালের ক্যাডার হলে ধর্ষণ ফ্রি'।

আশ্চর্য হয়ে যাই, এর কোনো প্রতিকার বা শাস্তি নেই। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে ধর্ষণ যে বহুলাংশে কমবেই একথা হলফ করে বলা যায়। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে বলব ধর্ষণ করার পর প্রমাণিত হলে একমাত্র শাস্তি ধর্ষকের লিঙ্গচ্ছেদন। এই শাস্তি শুরু হলে হাতে গোনা দশজনকে এই শাস্তি দেওয়ার পর তা সংবাদপত্রে প্রকাশ হলে এই প্রকার যৌনবিকৃত ধর্ষকের সংখ্যা যে কমবে একথা বলাই বাহুল্য।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী।

ইয়াজদি হত্যা

ইরাকের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ইয়াজদি। তারা মুসলমানও নয় আবার খৃস্টানও নয়। এদের সংখ্যা খুবই কম। আর তাই অত্যাচার নেমে এসেছে। সুন্নিদের জঙ্গি সংগঠন আই এস আই এস তাদেরকে ধর্মান্তরিত হতে সময়সীমা বেঁধে দেয়। তারপর ইয়াজদি মেয়েদের দখল নেয়। ২০০ জন পুরুষকে হত্যা করে, অনেককে জীবন্ত কবর দেয়। তাদের একটাই দোষ যে তারা মুসলমান নয়। আই এস আই এস জঙ্গিরা কোরানের নির্দেশে চলছে। কোরানে খৃস্টান ছাড়া বাকিরা শয়তানের পূজা করে বলে লেখা আছে। ইয়াজদিদের সুন্নি ও শিয়ার লড়াইয়ে কিছু করার নেই, তবুও মরতে হচ্ছে। ইরাকের মানবাধিকার মন্ত্রী মোহম্মদ শিয়া আল সুদানি এই হত্যার জন্য সুন্নি জঙ্গিদের দায়ী করেছেন। কেননা আলবাগদাদির সুন্নি সংগঠন আই এস আই এস ইয়াজদিদের শয়তানের পূজক বলে ঘোষণা করেছে। তাদের কথা— হয় মুসলমান হও, না হয় প্রাণ দাও। একদিকে ইয়াজদিদের হত্যা অন্যদিকে সুন্নিদের আনন্দ চিৎকার ইসলামিক বর্বরতার প্রমাণ দিচ্ছে। সুদান থেকে বাইরে যে খবর এসেছে তাতে জানা যাচ্ছে, জীবন্ত কবরে প্রাণ দিয়েছে অনেক শিশু ও স্ত্রীলোক। অনেক স্ত্রীলোককে শিকলে বেঁধে দাসী বানানো হয়েছে। ইয়াজদিদের শহর 'সিনজর' থেকে তাল-আকর বন্দিদের পাঠানো হয়েছে। এখন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষরা মুখে কুলুপ এঁটে কেন? আদৌ তাঁরা মুখ খুলবেন কি?

—**এন রায়,**
সোনারপুর।

কৃষক-দেবতা ভগবান বলরাম

অজিত কুমার বারিক

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছরেরও অধিক পূর্বে মথুরাতে সুর সেনের পুত্র উগ্রসেন রাজত্ব করতেন। তাঁর ভাই দেবকের কন্যার সঙ্গে বসুদেবের বিবাহ হয়েছিল। কংস বসুদেব ও দেবকী দুজনকেই কারাগারে প্রেরণ করেন। তার ভয় ছিল তাদের সন্তানই তাকে হত্যা করবে। কংস নিজের পিতাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করে নিজেই রাজা হয়ে বসেন। তিনি একে একে দেবকীর ছয় পুত্রকে হত্যা করেন। প্রজাগণের উপর তার অত্যাচার বাড়তে থাকে। প্রজারা দুঃখে গ্রাম ও নগর ছেড়ে জঙ্গলে পলায়ন করে। নিজের প্রয়োজনে সে দুষ্ট প্রকৃতির অসুরদের প্রশ্রয় দিতে থাকে। তারা জঙ্গল থেকে এসে পাশের গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। যে সব কৃষক ফসল ফলাত অসুরেরা ও কংসের দূতেরা তাদের ধরে নিয়ে যেত। গো সম্পদ ধ্বংস করে ফেলত। প্রজাদের উপর নানা রকমে রাজস্ব চাপিয়ে দিত। জনগণের সব রকমের মূল্যবান সামগ্রী কংসের রাজবাড়িতে পৌঁছে দিতে হোত। কেউ যদি কংসের আদেশ লঙ্ঘন করত তাহলে তার দুষ্ট অনুচর, কেশী, প্রলম্ব, ধেনুক, পুতনা প্রভৃতি অসুররা তাদের হত্যা করত। এর ফলে সমস্ত জনপদ উজাড় হয়ে যায়। লোকেরা ভয়ে চাষ ও পশুপালন করত না। অনাহারে অসংখ্য মানুষ মরতে থাকে। এই রকম সময়ই ভগবান শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে ধরাধামে।

বসুদেবের সপ্তম পুত্ররূপে দেবকীর গর্ভে ভগবান বলরামের জন্ম হলেও যোগমায়ার প্রভাবে দেবকীর গর্ভস্থ শিশু রোহিনীর গর্ভে স্থাপিত করা হয়েছিল। রোহিণী বসুদেবের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন। স্থানান্তরের পাঁচদিন পরে রোহিণীর গর্ভে ভাদ্রপদ শুভ শুক্ল ষষ্ঠীতে অভিজিৎ মুহূর্তে তুলা লগ্নে স্বাতি নক্ষত্রে বুধবার ভগবান বলরামের আবির্ভাব ঘটে। ভগবান বলরামের ১১ মাস ১৭ দিন পরে ভাদ্রপদ কৃষ্ণা অষ্টমীতে দেবকীর অষ্টম পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কংসের কারাগারে হয়েছিল। কংসের কবল থেকে শিশুপুত্রকে বাঁচাতে বসুদেব পরিকল্পনা করে গভীর নিশীথে গোপনে নন্দ রাজার ঘরে ব্রজধামে পৌঁছে দেন। এখানে কৃষ্ণ-বলরাম নন্দরাজা ও যশোদার পুত্ররূপে পালিত হতে থাকেন।

সে সময় আজকের মতো কেবল মথুরা রাজ্যই নয় সম্পূর্ণ দেশে আসুরিক অত্যাচারে হাহাকার রব ওঠে। কংস ও জরাসন্ধ ছিল অসুরদের নেতা। হস্তিনাপুরের দুর্যোধন, ব্রজের কালিয়া নাগ, চেদিরাজ শিশুপাল এদের দুষ্কর্মের সহযোগী ছিলেন। এছাড়া নরকাসুর, প্রলম্বাসুর, ধেনুকাসুর, তৃণাবর্ত, ভৌমাসুর, বকাসুর, কালযবন, দন্তবক্র, বানাসুর প্রমুখরা জলে ও স্থলে সন্ত্রাস চালায়। শৈশবে খেলার ছলেই অনেক অসুরের প্রাণ হরণ করেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম। শ্রীকৃষ্ণচরিতে জানা যায় যে শ্রীবলরাম ধেনুকাসুর, প্রলম্বাসুর, মুস্টিক কুট, ত্রিবিধ, কোলাসুর সৃষ্টিসুদামা ন্যায়গ্রোদ, কঙ্ক প্রভৃতি অসুরদের হত্যা করেন। গোবর্ধন পর্বতের উত্তর দিকে যমুনা তটে তালবনে 'গাধারূপী' ধেনুকাসুরকে বধ করেন শ্রীবলরাম। একদিন খেলার সময় ছদ্মবেশে প্রলম্বাসুর ঢুকে পড়ে গোপবালক বেশে তাদের দলে। কৌশলে বলরামকে অপহরণ করে দূরে পালাতে চেষ্টা করে। বলরাম সেখানে তাকে মুষ্ট্যাঘাতে হত্যা করেন। দুই ভাইয়ের মিলিত শক্তিতে কংস জরাসন্ধ, দন্ত বক্র রুকমী প্রভৃতিরা নিহত হয়। কৃষ্ণ ও বলরামের পরাক্রমের পরিচয় পেয়ে কংস ভীত সন্ত্রস্ত হয়। তখন কৌশলে তাদের হত্যা করার পরিকল্পনা করে দরবারে মল্লক্রীড়া মহোৎসবের আয়োজন করেন। সেখানে কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যা করার সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার সভাসদ ঋষি অক্রূরকে তাদের আনতে পাঠান। কৃষ্ণ-বলরাম অসুর শক্তিকে ধ্বংস করতে কংসের আমন্ত্রণ গ্রহণ

করেন এবং মল্ল ক্রীড়াস্থলে উপনীত হন। প্রথমে মদমত্ত কুবলয় হাতি, চানুর মুষ্টিক প্রমুখ মল্লবীরদের হত্যা করেন তারা। শেষে কংসকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হত্যা করেন। জামাতা হত হওয়ায় জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে আক্রমণ করলে জরাসন্ধ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন।

ভগবান শ্রীবলরামকে বলা হয় কৃষি এবং কৃষকের দেবতা। তিনি আজকের তথাকথিত নেতার মতো গায়ে মানে না আপনি নেতা ছিলেন না। তিনি নিজে কৃষক ছিলেন, তিনি কৃষিকে অগ্রাধিকার দান করে তার বিকাশে সব সময়ে সচেষ্ট ছিলেন। কৃষকের লাঙ্গল ও মুসল ছিল তার কাজের উপকরণ।

কৃষির উন্নত পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়ে ছিলেন তিনি। তিনি শস্য বিজ্ঞান, ফার্মিং সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। সারা দেশের অনেক নদী-নালাকে দূষণমুক্ত করেছিলেন। বহু জলস্রোত ও জলাশয় নির্মাণ করেছিলেন। নতুন বীজ, উন্নত বীজ তৈরি করা এবং কৃষকেরা নিজেই বীজ তৈরি করতে পারলে তার শিক্ষার প্রেরণা দেওয়ার মহান কাজ তিনি করেছিলেন। এইভাবে তিনি কৃষকদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর করে গড়ে তুলেছিলেন।

কৃষিতে আজ আমরা যা দুর্দিন দেখছি তা পশ্চিমের ভুল কৃষি নীতির পরিণাম। শ্রীবলরামের কৃষি আন্দোলনের ভিত্তি ছিল ভারতীয় আর্থিক সিদ্ধান্তের উপর। তিনি এক প্রকার কৃষি অর্থশাস্ত্রের জনক ছিলেন। কৃষিকাজে তার প্রচলিত নিয়মে উৎপাদন মূল্য কম এবং উৎপাদন অধিক হবে। ট্রাক্টর, রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের প্রয়োগ করে খরচ বেশি হয়ে থাকে, উৎপাদন কম হয়ে থাকে। জল সেচে বেশি খরচ হয়। প্রাকৃতিক উপাদান কমে গিয়ে ভয়াভয় অবস্থার সৃষ্টি করছে। আবহাওয়া দূষণ বেড়ে যাচ্ছে এবং মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। লাঙ্গল ও বলদে উৎপাদিত ফসল অতি মধুর স্বাদযুক্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবান বলরাম দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। উভয়ে একে অপরের পরিপূরক ছিলেন, আবার এক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম সংস্থাপন, বলরামের কৃষির পুনর্স্থাপন একই কাজ ছিল। কৃষির পুনর্স্থাপন ধর্মসংস্থাপনের আর এক রূপ। ভগবান বলরাম কৃষিশাস্ত্র, আন্দোলন শাস্ত্র এবং সংগঠন শাস্ত্রে জ্ঞানী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপালন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি অদ্বিতীয় সংগঠকও ছিলেন।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ ভাদ্র শুক্ল ষষ্ঠী পবিত্র দিনটি ‘কৃষক দিবস’ রূপে উদ্‌যাপন করে থাকে। তারা কৃষিশাস্ত্র ও সংগঠন পদ্ধতি ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করে। বলরামের কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন। তাঁর এই নীতি অনুসরণ করে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ একটি অরাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী সংগঠন হিসাবে সারা ভারতে কৃষকদের কল্যাণের কাজে রত আছে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

নেত্রদান মহাদান

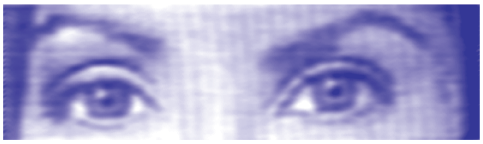

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

পৌরাণিক নগর কলিঙ্গ

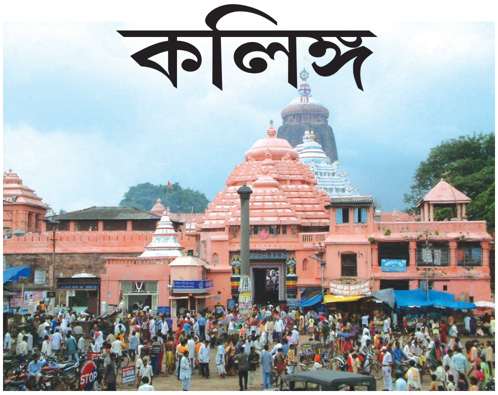

গোপাল চক্রবর্তী

প্রাচীনকালে কশাই (কপিশা) ও বৈতরণী নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ (অর্থাৎ আধুনিক বালেশ্বর জেলা ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ) উৎকল নামে খ্যাত ছিল এবং বৈতরণী থেকে গোদাবরী (পরে কৃষ্ণা থেকে মহানদী) পর্যন্ত বিস্তৃত দেশকে কলিঙ্গ বলা হোত। প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের রাজধানী ছিল ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী তোসলি নগরী। ওড্র জাতীয় রাজগণের অধিকার বিস্তারের ফলে ভৌগোলিক নামটিরও অর্থ বিস্তৃতি ঘটে। ফলে ওড্র ও উৎকল নামদ্বয় সমার্থক হয়ে যায়। পরে সমগ্র ওড়িয়াভাষী অঞ্চল সম্পর্কে নাম দু'টি প্রযুক্ত হতে থাকে। বৌধায়ন ধর্মসূত্র (খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ) থেকে জানা যায় কলিঙ্গ প্রভৃতি অনার্যদেশে ভ্রমণ করলে আর্যগণকে প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হতে হোত। পরবর্তীকালের একটি পৌরাণিক শ্লোকে বলা হয়েছে যে, তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কলিঙ্গাদি দেশে ভ্রমণ করলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না। প্রাচীন কলিঙ্গের সীমান্তে অবস্থিত বিরজা তীর্থ বা যাজপুর সেই যুগে পূর্ব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান রূপে গণ্য হোত। আবার মহাভারতের কর্ণপর্বে দেখা যায় কলিঙ্গ দেশের অধিবাসীদের শাশ্বত ধর্মজ্ঞ বলে খ্যাতি ছিল। বিষ্ণুপুরাণ মতে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মৈত্রেয়ারণ্য অর্থাৎ আজকের কোণারকে এসে এক সরোবরের তীরে সূর্যের আরাধনা করেন। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের আরাধনায় তুষ্ট সূর্যদেব বর দেন শাম্বকে। রোগমুক্ত হন শাম্ব। আরোগ্য লাভের পর শাম্ব মন্দিরগড়ে সূর্যদেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই স্মারক রূপে অদ্যাবধি মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে চন্দ্রভাগা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমে উৎসব ও মেলা বসে।

১৪ শতকে সমগ্র বাংলা ও বিহার মুসলমান শাসনাধীনে গেলেও কলিঙ্গ দেশে হিন্দুধর্ম তথা মন্দির সমূহ অটুট থাকে। তবে ১৫৬৮ খৃস্টাব্দে কালাপাহাড়ের (ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তান কালাচাঁদ রায়) কাছে শেষ হিন্দুরাজা মুকুন্দদেবের পরাজয়ে বিভীষিকা নামে কলিঙ্গ তথা সমগ্র ওড়িশায়। কোণারকের মন্দির এই ধ্বংসলীলার শিকার হয়। এরপর ধ্বংস হতে থাকে মন্দির নগরী।

তীর্থমাহাত্ম্যে কলিঙ্গ অন্যতম। আর এখনকার অন্যতম আকর্ষণ পুরীর জগন্নাথ মন্দির। সত্যযুগে কোনো এক সন্ন্যাসীর কাছে বার্তা পেয়ে অবন্তীরাজ সূর্যবংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতিকে পাঠান বিষ্ণুর সন্ধানে ওড্র (ওড়িশা) দেশে। বিদ্যাপতির দর্শনও মেলে শবর গৃহে নীলমাধব রূপে বিষ্ণুর। ইন্দ্রদ্যুম্নও ওড্রে এলেন বিষ্ণু দর্শনের প্রত্যাশায়। বিফল ইন্দ্রদ্যুম্ন। নারদ সান্ত্বনা দেন শিলায় নয় দারুতে দর্শন মিলবে বিষ্ণুর। নীলমাধবের স্বপ্নাদেশ মতো দারুও মেলে চক্রতীর্থে।

কিংবদন্তী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাভি অর্থাৎ পরমব্রহ্ম দ্বারকা থেকে ভেসে আসে পুরীর সমুদ্রে ব্রহ্মদারুরূপে। স্বপ্নাদেশ পেয়ে বিশাল মন্দির নির্মাণ করান ইন্দ্রদ্যুম্ন। স্বয়ং বিশ্বকর্মা এলেন সূত্রধর রূপে সেই ব্রহ্মদারু থেকে বিগ্রহ নির্মাণের জন্য। রুদ্ধদ্বার কক্ষে একুশ দিনে বিগ্রহ সম্পূর্ণ হবার কথা। কিন্তু অধৈর্য রাণী দ্বাদশ দিনে দ্বার উন্মোচন করে ফেললেন। দেখেন সূত্রধর নেই, বিগ্রহ অসম্পূর্ণ, হাত পা তখনও বাকি। রাজা সেই অসম্পূর্ণ বিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন— জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা আর সুদর্শন চক্র। পৌরাণিক যুগের সেই মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে রাজা যযাতি কেশরী নতুন মন্দির গড়েন। আর ব্রাহ্মণ নিধনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজা অনঙ্গভীমদেব ১১৯৮ খৃস্টাব্দে নির্মাণ করান বর্তমান মন্দিরের। তারপর গজপতি রাজাদের অর্থানুকূল্যে এর শ্রীবৃদ্ধি।

প্রাচীন কলিঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা পৌরাণিক কাহিনী। দেবী পুরাণের মতে বর্তমান বিষ্ণু সরোবরের প্রাচীন নাম ছিল একাম্রকানন। পার্বতীর খুব প্রিয় ছিল এই কানন। একদা বিহারে বেরিয়ে কৃত্তি ও বাস নামে দুই দানবের সম্মুখে পড়ে যান পার্বতী। তারা পার্বতীকে বিয়ে করতে চায়। পার্বতী রাজি। তবে শর্ত এক। সেই শর্ত অনুযায়ী পার্বতীকে কাঁধে তুলল ওরা। আর দেবীর ভারে ধুলোয় মিশে গেল। পার্বতী ক্লান্ত, পিপাসার্ত। এলেন শিব। পার্বতীর পিপাসা মেটাতে তৈরি হলো সরোবর।

শিবের আহ্বানে সমস্ত নদ-নদী, সরোবর বিন্দু বিন্দু করে জল দিল। সেই থেকে নাম বিন্দু সরোবর। আর কাছেই লিঙ্গরাজ। লিঙ্গরাজকে ঘিরে ভুবনেশ্বরের মন্দির রাজি।

খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগধে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দ কলিঙ্গ জয় করেন। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে মৌর্য সম্রাট অশোক পুনরায় কলিঙ্গদেশ জয় করেন। মগধ সাম্রাজ্যের পতনের পর খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গ 'মহামেঘবাহন' নামক এক আর্যরাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা পৌরাণিক চেদীবংশের একটি শাখা। মহাপরাক্রান্ত কলিঙ্গরাজ খারবেল এই বংশের নৃপতি। খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে মগধে গুপ্ত বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে কলিঙ্গ দেশে গুপ্ত অধিকার প্রসারিত হয়।

ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হলে সমগ্র ওড়িশা অঞ্চলে কয়েকটি স্বাধীন রাজবংশ রাজত্ব করতে থাকে। অবশেষে আফগান, মোগল এবং সবশেষে ইংরেজ শাসনাধিনে থাকে কলিঙ্গ তথা ওড়িশা। ১৯৪৭ সালে ভারত দেশ স্বাধীন হলে দেশীয় রাজাদের শাসনাধীকারও লুপ্ত হয়, ফলে কলিঙ্গ সহ ওড়িশার সর্বত্র রাজ্য সরকারের অধিকার বলবৎ হয়। ■

চিরদিনের পরামর্শ

নবাঙ্কুর

নিয়ম মানার শিক্ষা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আজ তোমাকে আদর্শ ছাত্র হতে হবে। এবং আদর্শ ছাত্র মানে শুধু বই মুখস্থ করা নয়। আজ আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে বুঝতে হবে, তারা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তাদের জাতির প্রতিনিধি। তার কথাবার্তা, তার আচরণ, তার ব্যবহার, তার ওঠা-বসা, তার সঙ্গে শুধু তার নিজের নয়, তার জাতির সম্মান আর মর্যাদা বিজড়িত।

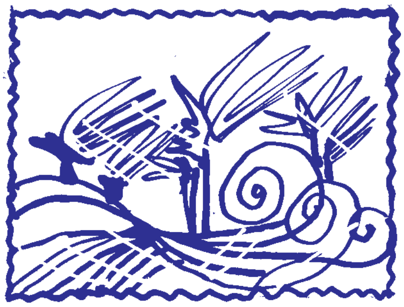

এই জিনিসটা বোঝা মানেই হলো চরিত্রবান হওয়া। জাতিগতভাবে আমাদের চরিত্রে অনেক দোষ এসে ঢুকেছে। তোমাদের জীবনে সজাগ ভাবে সেই সব দোষকে দূরে পরিহার করতে হবে। তবেই তোমরা হবে চরিত্রবান নাগরিক।

উদাহরণ স্বরূপ দু'একটা কথা বলি, — আমরা অত্যন্ত বাজে কথা বলি এবং অপ্রয়োজনীয় বেশি কথা বলি। ছেলেদের মধ্যেও দেখতে পাবে কথায় অর্থহীন রসিকতা খুব বেড়েই চলেছে। যে বেশি কথা বলে এবং বাজে কথা বলে তার কথার মূল্য-জ্ঞান থাকে না। আমাদের কথার মধ্যে মূল্য-জ্ঞান খুব কম। আমরা শৃঙ্খলা মানতে জানি না। নিজের সুবিধের জন্যে যে-কোনো নিয়ম অনায়াসে ভাঙতে পারি। নিজের দোষের চেয়ে প্রতিবেশীর দোষ বেশি করে দেখি। সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়ে উঠি। এবং অধিকাংশ কাজ উত্তেজনাবশেই করে ফেলি। এইরকম অনেক উদাহরণ দিতে পারি।

আমাদের প্রত্যেক দিনের ছোট ছোট কাজে এইসব দোষত্রুটি লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে। এইসব দোষ-ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। প্রত্যেক ছাত্রের ওঠা-বসা, আচরণ, কথা-বলা এমন হবে যে কেউ নিন্দা করতে না পারে। এইভাবে এইসব দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে যখন আমরা উঠতে পারবো, তখনই আমরা হবো জাতীয় চরিত্রবান আদর্শ নাগরিক। আজ ভারতবর্ষ চায় এই জাতীয় চরিত্রবান আদর্শ নাগরিক।

একজন বাঙালি, তা সে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তাকে দেখে অপর জগতের লোক এখন বলবে, লোকটা বাঙালি অতএব সে মিথ্যা বলতে পারে না, লোকটা বাঙালি অতএব সে দেরি করে আসতে পারে না, লোকটা বাঙালি অতএব সে ভয় পেতে পারে না, তখনি জানবে আমাদের শিক্ষা সার্থক হয়েছে, আমাদের জাতিগত চরিত্র গড়ে উঠেছে। সেই জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ তোমাদের ওপর। সুতরাং দেখবে তোমাদের কর্তব্য আর দায়িত্ব আপনি বেড়ে গিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে যদি নিয়মের অনুশাসন মেনে চলতে না শেখো, তাহলে জীবনে কোনোদিনই এই চরিত্র গড়ে তুলতে পারবে না। যে যেখানেই থাক, তার চরিত্র গড়ে তুলতে হলে, তাকে একটা নিয়মের অনুশাসন মেনে চলতেই হবে। জীবনের একটা অংশ তাকে কঠোরভাবে এই নিয়ম-সংযম মেনে চলতে হবে। আজ তোমাদের জীবনে এসেছে সেই নিয়ম-সংযম পালন করবার সময়। আজ কোনো অনিয়মের জন্যে নিজেকে ছেড়ে দিলে, নিজেকে আর গড়ে তুলতে পারবে না।

নিয়ম মানা কষ্টদায়ক। অনিয়ম করার মধ্যে একটা আপাত সুখ আছে। পৃথিবীতে সত্যিকারের সুখ পেতে হলে, কতখানি সুখের লোভ ত্যাগ করতে হয় তা বুঝতে হবে। আর একটা জিনিস বুঝতে চেষ্টা করো, নিয়ম মানার মধ্যে যে বীরত্ব আছে, তার শতাংশের একাংশও নেই নিয়ম ভাঙার মধ্যে। যে নিয়ম মানতে শেখেনি, সে যখন নিয়ম ভাঙতে যায়, তখনি হয় ভুল। নিয়ম একমাত্র সার্বিকভাবে সেই ভাঙতে পারে, সে শিখেছে নিয়ম-মানা কি।

সংকলন : কৌশিক গুহ

রঙ ভরো

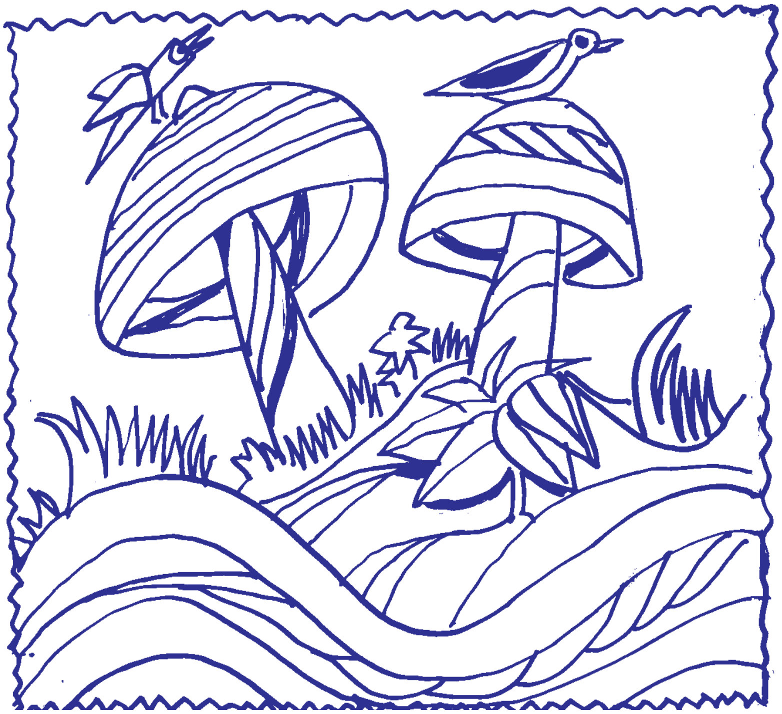

প্রশ্নবাণ

১. ভারতে প্রথম ট্রেন চলেছিল কবে? কোথা থেকে কোথায়?

২. দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে? সাধারণ মানুষ তাঁকে কোন্ নামে চিনতেন?

৩. জালিয়ানওয়ালাবাগ কোথায়? সেখানে কি ঘটেছিল? কবে?

৪. লাল-বাল-পাল এই পরিচয় ছিল যাঁদের, তাঁদের পুরো নাম?

৫. জেনারেল ডায়ারকে কে হত্যা করেন? কোথায়?

উত্তর : ১. ১৬ এপ্রিল ১৮৫৩। বোম্বে থেকে থানে। ২. সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। লৌহমানব। ৩. পাঞ্জাবের অমৃতসরে। জেনারেল ও ডায়ার যিনি সাধারণ নাগরিকদের জমায়েতে গুলি চালাবার নির্দেশ দেন। ১৩ এপ্রিল ১৯১৯। ৪. লালা লাজপত রায়। বালগঙ্গাধর তিলক। বিপিনচন্দ্র পাল। ৫. সর্দার উধম সিং। লন্ডনে।

ছবিতে তফাত খোঁজা

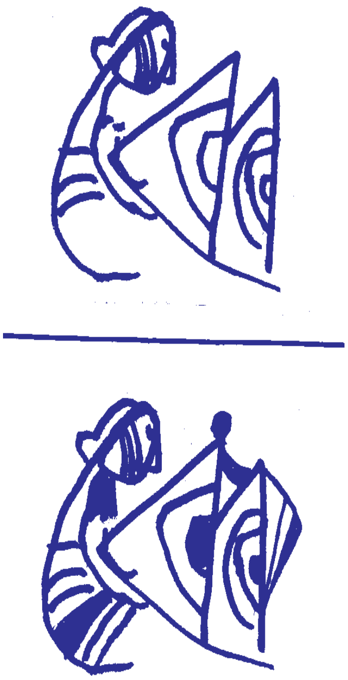

এসো আবার পড়ি

পাখির মতো

আল মাহমুদ

আম্মা বলেন, পড়রে সোনা
আব্বা বলেন, মন দে।
পাঠে আমার মন বসে না
কাঁঠাল চাঁপার গন্ধে।
আমার কেবল ইচ্ছে জাগে
নদীর ধারে থাকতে,
বকুলডালে লুকিয়ে থেকে
পাখির মতো ডাকতে।
সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে
কর্ণফুলির কূলটায়
দুধভরা ওই চাঁদের বাটি
ফেরেস্তারা উলটায়।
তখন কেবল ভাবতে থাকি
কেমন করে উড়ব,
কেমন করে শহর ছেড়ে
সবুজ গাঁয়ে ঘুরব।
তোমরা যখন শিখছ পড়া
মানুষ হওয়ার জন্য,
আমিই না হয় পাখিই হব
পাখির মতো বন্য।

নারী কি অবলা ?

রুণা চৌধুরী (রায়)

বর্তমানে হাই-টেকনোলোজির যুগে মহিলাদের উপর অত্যাচার ও বৈষম্যের মাত্রা ক্রমবর্ধমান। শতরূপা নারী তার একই অঙ্গে এতো রূপ নিয়ে মা-বোন-বধূরূপে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টায় রত রয়েছেন। নারী জন্মদাত্রী, ভ্রূণ হত্যার বিরোধী। কখনও জগদ্ধাত্রী, কখনও দেবীদুর্গা, মহাকালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী রূপে যুগযুগান্ত ব্যাপী পূজিতা হন নারীমূর্তি। অথচ সেই নারীই ধর্ষিতা হন অসুর শক্তির দ্বারা। পুরুষশাসিত সমাজের হৃদয়হীন, স্বার্থপর, পক্ষপাতদুষ্ট লোভ লালসার ঘৃণ্য-পৈশাচিক উল্লাসে তাদের প্রীতিময় স্বপ্নের নীড় দিয়েছে ভেঙে। যুগের পরিবর্তনে কত নারীকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে তার হিসেব নেই। এর পরেও কি নারীর প্রতি অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে না কমেছে সেতো দৈনন্দিন খবরের কাগজ, টিভির নিউজ চ্যানেল, ব্রেকিং নিউজ দেখলেই শিহরিত হতে হচ্ছে। শিশু থেকে বৃদ্ধা কারোরই নিস্তার নেই।

স্কুল-কলেজে নিষ্পাপ ছাত্রীকে যৌন শোষণ করার খবর পাওয়া যাচ্ছে। পীড়িত নারীর অনেকেই মৃত্যু বরণ করে ব্যথা-বেদনার অবসান ঘটিয়েছে। ধনঞ্জয়ের ফাঁসীতেও সমাজ সচেতন হয়নি। তারপরও পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পর গলা টিপে হত্যা করে কুয়োয় নিক্ষেপ করা হয়েছে।

বিশাল বৈচিত্র্যময় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ষণলীলা মহামারীর ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। বহু কলঙ্কিত পণপ্রথা, বধূ নির্যাতন, অবহেলা-অবজ্ঞার পাষাণভার বুকে নিয়ে নারীরা করুণ আর্তনাদ করে চলেছে। প্রতিবাদ করলেই ধর্ষণ করে মেরে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও জীবন্ত পুড়িয়ে লাশ গুম, কোথাও অ্যাসিড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। রাজধানীর রাজপথে বেদনাদায়ক ধর্ষণ কাণ্ডে প্যারা-মেডিকেল ছাত্রী নির্ভয়ার মৃত্যুতে দেশে এক নির্লজ্জ, কলঙ্কময় অধ্যায় সূচিত হয়েছে। দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক— সব স্লোগান, তীব্র প্রতিবাদ ক্রমে ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছে। দুষ্কৃতীরা সদর্পে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রশাসন নির্বিকার, নিশ্চুপ। চারিদিকের পৈশাচিক বর্বরতার প্রতিবাদে সমাজ জাগরিত হলে এবং প্রশাসন কঠোর হস্তে নরপিশাচদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলে নারী সবলা হতেই পারতো। ■

আত্মপ্রত্যয়ী এক নারী

মহুয়া দাস

মনের জোর ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করা যায় তা প্রমাণ করেছেন ২৯ বছর বয়সী সারিকা জৈন। ২০১৩ সালের ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় ১,১২২ জন সফল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৫২৭তম স্থান দখল করেছেন। তাঁর কথায়— ‘‘যদি কঠোর পরিশ্রম করা হয় এবং দৃঢ় প্রত্যয় থাকে তবে সফলতা আসবেই।’’

ওড়িশার বোলাঙ্গির জেলার কাঁটাবাঁজি গ্রামের সারিকা বাকিদের থেকে একটু আলাদা। ছোট্ট মুদিদোকানের মালিক, ৫৮ বছর বয়সী সাধুরাম জৈনের মেয়ে সারিকা ছোট থেকেই পোলিও আক্রান্ত। কিন্তু পা ৫০ শতাংশ পোলিও আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রথমবারেই দেশের সব থেকে কঠিন ও সব থেকে সম্মানজনক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন। তাই নিজেও খুব খুশি।

সারিকার লেখাপড়া শুরু তাঁদের গ্রামেরই স্থানীয় সরস্বতী শিশু মন্দির থেকে। যখন কোনও স্কুলই প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে ভর্তি নিতে চায়নি তখন শিশুমন্দির কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্কুলে ভর্তি করে নেন। তাঁর কথায়— শিশুমন্দিরের আচার্য-আচার্যাদের ভালবাসা ও প্রেরণা সারিকাকে লড়াই করার শক্তি জুগিয়েছে, আর এখান থেকে পাওয়া সংস্কার তাঁর সারাজীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। তাই যখন প্রস্তুতির শুরুতে চাপের ফলে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তখন সেই প্রেরণাই তাঁকে লড়াই করার শক্তি দেয়। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাই মানসিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

যদিও ছোট থেকে আই এ এস অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন না, কারণ গ্রামে এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার মতো কোনো পরিকাঠামো ছিল না। ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হবার। কিন্তু স্থানীয় কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ না থাকায় কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়, পরে সারিকা সি এ পাশ করেন। ■

বিদেশনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতার ছাপ রাখছে বিদেশ মন্ত্রক

অতিথি কলম

ময়ূরী মুখার্জি

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন বিরোধীদের চাপ অগ্রাহ্য করে চলতি ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডের যুদ্ধে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব না এনে রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার নিদর্শন রাখলেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। মনে রাখা জরুরি, ভারতের সঙ্গে ইজরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, উভয় দেশই ইসলামীয় যৌথ সন্ত্রাসবাদের শিকার। এই পটভূমিতে বিদেশ মন্ত্রকের দৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাব দীর্ঘদিনের কূটনীতিক্ষেত্রে চলে আসা ভ্রান্তিকে দূর করার সহায়ক হবে।

চিরাচরিতভাবে নতুন দিল্লী আরবীয় শক্তির পক্ষ অবলম্বনই শ্রেয় মনে করেছে। যার পরিণতিতে 'full support for Palestinian Cause' এক রকম চিরস্থায়ী সিদ্ধান্ত হিসেবেই গৃহীত হয়ে আছে। কিন্তু এই কূটনৈতিক অবস্থান সেভাবে দেশের কোনো উপকারেই আসেনি।

তবুও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে পরেও এই তোষণ নীতির ব্যর্থতাকে হিসেবের মধ্যে না এনে দেশের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে আরবদের পক্ষে ও ইজরাইল বিরোধী অবস্থান নেওয়াটা পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, এই অবস্থান কিন্তু সেই সময়ে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে হয়নি, হয়েছিল আর কেউ নয় স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর পরীক্ষামূলক আদর্শবাদের জেরে। দু'শো বছরের বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া ভারতবর্ষ ইজরায়েলকে এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে দেখার মিথ্যা নীতিকেই অবলম্বন করেছিল। এই তকমা আজও দিল্লীর প্রাচীনপন্থীরা ঝেড়ে ফেলতে নারাজ— ইজরায়েল সাম্রাজ্যবাদী দেশ। আর কমিউনিস্টদের কথা না বলাই ভাল, তাদের ভুল ভাঙতে শতাব্দী কেটে যেতে পারে।

আশ্চর্যের কথা, আরব শক্তির পেছনে ৮০'র দশক পর্যন্ত দীর্ঘ সময় এই একনিষ্ঠ সমর্থন জারি রাখার বিনিময়ে ভারত কিছুই পায়নি। উদাহরণ হিসেবে দেখুন কাশ্মীর সমস্যার ক্ষেত্রে আরব দুনিয়া ভারতের পক্ষে তো দাঁড়ায়নি, উল্টে পাকিস্তানের প্রতি তাদের সমর্থন আজও জারি আছে।

সঠিক ইতিহাসের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে ১৯৪৯ সালে যখন ইহুদিদেশ ইজরায়েলের রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরু সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন। কেননা চালু ছিল আরবকে সমর্থনের গৃহীত লাইন। কিন্তু এই তিনিই হায়দরাবাদ রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্তির সময় যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিত আরব দুনিয়ার তখনকার শক্তিশালী দেশ মিশরের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের পক্ষে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করতে দেখেননি। অত্যন্ত বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ নেহরু এর প্রতিবাদে ১৯৫০ সালে সরকারি ভাবে ইজরায়েলকে Recognition দেন (পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে আরও অনেক সময় লেগেছিল)।

এরপর অনেক জল গড়িয়ে গেলেও ভারতের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক কোনো ঘটনাই ঘটেনি। উল্লেখ্য ১৯৬৯ সালের 'রাবাত সম্মেলনে' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবল শক্তিশালী Organization of Islamic Conference গঠনের রাস্তা প্রস্তুত হলেও পরবর্তীকালে গঠিত এই আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে ভারতের আজও স্থান হয়নি। এরকম উদাহরণের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। মোদ্দা কথায় ভারতের কূটনীতির ক্ষেত্রে 'আরব দুনিয়াকে' তোষণ করে চলার লাইনটি আসলে দেশীয় ক্ষেত্রে মুসলমান তোষণ নীতিরই প্রলম্বিত রূপ। কি দেশে কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশ তা থেকে কখনই লাভবান হতে পারেনি। কেননা এটি সব সময়ই 'ওয়ানওয়ে' রাস্তা।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির শুরু :

নব্বই-এর দশকের শুরুতেই ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার নীতির চালু হওয়া ও পাশাপাশি সোভিয়েতের পতন এই যৌথ অভিঘাতই বাঁধাগৎ রাজনীতির পটভূমিতে রাজনীতির পটভূমিতে বদলের ইঙ্গিত নিয়ে এল। হ্যাঁ, আরব দুনিয়ায় গুণকীর্তন করার রেওয়াজ চালু থাকলেও ইজরায়েলের ক্ষেত্রে ভারতের বিদেশনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তনের সূচনা হয়।

প্রসঙ্গত ১৯৯২ সালে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর ভারত-ইজরাইল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নানান ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর বিশদ বিবরণ অনেক সময় জনসমক্ষে প্রদান করা হয়নি। যদি প্রমাণ চান তাহলে আজ বলতে হবে কার্গিলযুদ্ধের মহাসন্ধিক্ষণে ইজরায়েল ভারতের পাশে পূর্ণ সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল।

নতুন ভারত সরকার :

সুতরাং পরিস্কার হয়ে গেল আজকের বিদেশমন্ত্রকের তরফে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব গ্রহণ না করাটা চটজলদি সিদ্ধান্ত নয়। এর পশ্চাৎপটে রয়েছে দু'দশক ধরে নীরবে সংঘটিত ঘটনাক্রমের ভিত্তিতে নেওয়া সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ভাবনার ইতিহাস। ভারতের ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো ছুঁৎমার্গ তো নেইই, কোনো গোপন ভণ্ডামির কৌশলও নেই। বর্তমান বিজেপি সরকার অকপটে ঘোষণা করেছে ইজরায়েল দীর্ঘ সময় ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। দেশবাসীর বিপুল সমর্থনে নির্বাচিত

বিজেপি সরকারের কোনো জোটসঙ্গীর খামখেয়ালিপোনাকে মর্যাদা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন ছিল ইউপিএ সরকারের নীরবে রক্তচক্ষু দেখানো সঙ্গী সিপিএম যারা আজও ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমান হওয়ার কারণে প্যালেস্টাইনের দুঃখে কেঁদে ভাসাবার রোমান্টিকতা পোষণ করে। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিদেশনীতির নিরূপণ, বাস্তব অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন তো তাদের নেই। আর বিজেপি'র মুসলমান ভোট পাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি প্যালেস্টানীয় মুসলমানের বন্ধু সেজে ভণ্ডামিরও কোনো তাগিদ নেই। এই পটভূমিতেই মোদী সরকারের গোটা আন্তর্জাতিক কূটনীতির বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে।

প্রথমত, আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষে আগ বাড়িয়ে নাক গলাবার কোনো বাধ্যবাধকতা ভারতের নেই। দ্বিতীয়ত, মনে রাখা দরকার চলতি সংঘর্ষের ভিত্তিতে একটি সার্বভৌম দেশের (ইজরাইল) আক্রান্ত হওয়ার পর প্রত্যুত্তর দেওয়ার অধিকার সব সময় আছে।

আরব-ইজরায়েল সম্পর্কের বৃহত্তর ভৌগোলিক অবস্থান জনিত দীর্ঘমেয়াদি রাজনীতি যাই হোক না কেন এই চলতি সংঘর্ষটির উৎস কিন্তু প্যালেস্টানীয় জঙ্গিগোষ্ঠী 'হামাসের' প্ররোচনায় ঘটেছে। তথ্যাভিজ্ঞমহল নিশ্চয় জানেন 'হামাস' বিশ্বব্যাপী কুখ্যাত একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। এরাই ২০০৬ সাল থেকে প্যালেস্টাইনের 'গাজা' অঞ্চলে দখল রেখেছে।

প্রসঙ্গত প্যালেস্টাইন তিনটি অঞ্চলের যোগফলে গঠিত— (১) ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক অঞ্চল (২) গাজা স্ট্রিপ (ভূখণ্ড) (৩) ইজরায়েলের মধ্যেই থেকে যাওয়া প্যালেস্টানীয় মুসলমান জনগণ।

ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের প্যালেস্টানীয়রা শান্তিপূর্ণভাবে দীর্ঘদিন বসবাস করছে। ইজরায়েলের অধিবাসী প্যালেস্টানীয়রাও কোনো সন্ত্রাসী কাজে নিযুক্ত না থেকে নিরুপদ্রবে বসবাস করছে। ইজরায়েল-আরব সংঘর্ষের পরিমণ্ডল চির অশান্ত করে রেখেছে এই 'গাজা ভূখণ্ডের' জঙ্গি মুসলমান গোষ্ঠী। মনে হয় এই আক্রমণের ইজরায়েলি প্রত্যাঘাতকে যে ভাবে বর্তমানে চিত্রিত করা হচ্ছে, ইজরায়েল ক্রমশ তাদের সঠিক ভূমিকা আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কাছে তুলে ধরে বিশ্ব জনমত তাদের পক্ষে নিয়ে আসতে সফল হবে।

জঙ্গি হামাস বাহিনী :

নিজেদের মৌলবাদী ইসলামী প্রভূত্ব কায়েম রাখতে বদ্ধপরিকর এই জঙ্গি গোষ্ঠী গাজায় ২০০৬ সাল থেকে সক্রিয়। এদের স্যাঙাত ছিল ইজিপ্টের মুসলমান বেরাদরি (ব্রাদার হুড)। বেশ কিছুকাল যাবৎ সেখানকার মিলিটারি শাসনের ধাক্কায় তারা আত্মগোপনে চলে গেছে। ওদিকে সিরিয়াতে হামাস জঙ্গি সমর্থকদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে সেখানকার সরকার। তাই হামাস সঠিক অর্থেই বর্তমানে হীনবল। এই নিরাপত্তাহীনতা কাটাতে তারা গত জুনমাসে চিরশত্রু Fatah গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিলিজুলি সরকার করেছে। এর পরেই হামাস যে কাজে সিদ্ধহস্ত সেই রকেট নিক্ষেপ শুরু করে দেয়। আক্রমণ শানায় 'ইহুদি'-রাষ্ট্রের জেরুজালেম ও তেল আভিভের ওপর। এই সংঘর্ষের বাতাবরণ শুরু হতেই এর প্রতিক্রিয়া হয় প্রান্ত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক অঞ্চলেও সেখানে হামাসপন্থীরা তিনটি ইজরায়েলি টিন-এজারকে অপহরণ করে খুন করে। এই সূত্রেই ইজরায়েল 'হামাস' সমর্থকদের ধরপাকড় শুরু করে। পারস্পরিক শত্রুতার বৃদ্ধি ঘটিয়ে একটি প্যালেস্টানীয় কিশোর খুন হয়। চতুর্গুণ তীব্রতায় 'হামাসের' রকেট আছড়ে পড়ে ইরজায়েলের ওপর। কিন্তু এই ধরনের আক্রমণের আগাম মোকাবিলায় ইজরায়েলের বিখ্যাত 'Iron Dome' এই আঘাত সফলভাবে প্রতিহত করে। প্রাণহানির সংখ্যাও তাই কম। এরই প্রত্যাঘাতে জুলাই ৮ থেকে গাজার ওপর ইজারায়েল বোমা নিক্ষেপণ শুরু করে। আর যেহেতু উদ্দেশ্য সাধন করতে নিরীহ নাগরিকদেরই হামাস সামনে রেখে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছিল তাই 'গাজায়' জীবনহানির সংখ্যাও হয়েছে প্রচুর। অথচ যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাবও গোড়ায় তারা প্রত্যাখান করেছে।

লক্ষণীয় ১৭ জুলাই অবস্থার চরম অবনতি ঘটিয়ে ১৩ জনের একটি 'হামাস' জঙ্গিবাহিনী ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ইজরায়েলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। তারা দু'জন ইজরায়েলি সৈন্যের প্রাণহানি ঘটায়। সুড়ঙ্গ পথে এই গোপন আক্রমণের পরেই ইজরায়েলের প্রত্যাঘাত তীব্রতর হয়। তারা স্থলপথেও আক্রমণ শানায়। নিজ ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে প্রতিরক্ষার অধিকার যে কোনো স্বাধীন দেশেরই আছে। এই নিরিখে কিছু ঘটনার উল্লেখ অত্যন্ত জরুরি। হামাস বরাবরই সুড়ঙ্গ তৈরি করে ইজরায়েলের ওপর সংঘর্ষ চালানোর চেষ্টা করে আসছে। ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা বলেই সরকার মনে করে। প্রসঙ্গত ২০০৬ সালে একজন ইজরায়েলি সৈনিককে হামাস এই সুড়ঙ্গ পথেই অপহরণ করেছিল। ৫ বছর পরে ১০২৭ জন প্যালেস্টানীয় জঙ্গীর মুক্তির বিনিময়ে তারা ওই সৈনিককে ছাড়ে। ওই ১০২৭ জন বর্তমানে হামাসের জঙ্গি-বাহিনীর সক্রিয় কর্মী।

শেষ উপায় :

মনে রাখা দরকার এই ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ অত্যাধুনিক কৃৎকৌশলে তৈরি। প্রযুক্তিগত ভাবে অত্যন্ত উন্নত। গাজার আক্রমণের উৎসস্থল নির্মূল করতে হলে এগুলির ধ্বংস আবশ্যিক। কিন্তু এই ধ্বংস প্রক্রিয়া মুখের কথা নয়। স্থলপথে সংঘর্ষ চালিয়ে দীর্ঘদিন দিন ধরেই কেবল তা করা সম্ভব। এর পরিণামে দু' পক্ষেরই বিপুল প্রাণহানির সম্ভাবনা। এরই সঙ্গে বিনাশ দরকার গাজায় হামাসের দীর্ঘকালীন যুদ্ধ চালানোর উদ্দেশ্যে নির্মিত বিপুল সামরিক পরিকাঠামোর। এক্ষেত্রেও তুমুল প্রাণহানি ঘটবে। এই দীর্ঘস্থায়ী হিংসার বাতাবরণে থেকে মুক্তি পেতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে গাজা ভূখণ্ডের সামরিক ধাঁচা ভেঙ্গে ফেলা দরকার। তবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থাকলেও দু' দেশকেই ভাল রকম পারস্পরিক ছাড় দিতে হবে। যা শুধু প্রতিবাদী মিছিল করে ফটো তোলানো ব্যাপার নয় আদতে বেশ জটিল। তাই ভারতকে আগু-পিছু ভাবতেই হবে। ■

ডব্লু টি ও বিতর্ক : দেশের মানুষের খাদ্য-সুরক্ষা নিশ্চিত করাতেই মোদী সরকারের অধিক গুরুত্ব

এন. সি. দে

গত ২০ জানুয়ারি সংখ্যার ‘স্বস্তিকা’ সাপ্তাহিকে ডব্লু টি ও-র বালি সম্মেলনে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী আনন্দ শর্মার ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছিলাম যে এটা কংগ্রেস সরকারের জয় হতে পারে, কিন্তু ভারতের মানুষের বিজয় নয়। কংগ্রেস দলের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের সরকার দখল। দেশের স্বার্থ রক্ষা করা তার কোনোকালেই কাজ ছিল না। ইউরো-মার্কিন বানিয়াদের মূল লক্ষ্য ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজার দখল। সেই ২০০১ সালে দোহা সম্মেলনে বাজপেয়ী সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী মুরাসলি মারান যেভাবে ইউরো-মার্কিন বানিয়াদের দাদাগিরির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বাণিজ্যিক লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে তৈরি Trade Facilitation Agreement (TFA) সই করাতে পারেনি ওরা। কংগ্রেস ও ইউরো মার্কিন বাণিজ্য দস্যুদের লক্ষ্যের মিল এখানেই। দেশের শিল্প, কৃষি, অর্থনীতি, ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে কংগ্রেস দেশের মানুষের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিল। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভের সম্ভাবনা তাদের কাছে ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ওদিকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি জনগণের কাছে ‘কংগ্রেস মুক্ত’ ভারতের আহ্বান জানাচ্ছিল। এই অবস্থায় কংগ্রেস-এর কাছে রাজকোষের অর্থ ছড়িয়ে ভোট কেনা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। কিন্তু সে পথে তারা নিজেরাই কাঁটা বিছিয়ে রেখেছিল অতীতে। সাম্রাজ্যবাদী ওই পশ্চিমী বাণিজ্য দস্যুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস সরকারই সেদিন ‘ডব্লু টি ও’ গঠন করেছিল। এই পশ্চিমী বাণিজ্য-দস্যুরা ডব্লু টি ও-র মাধ্যমে একের পর এক চুক্তি করে ভারতের মতো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ করে চলেছে। তার এক নম্বর প্রমাণ হলো দেশের গরিব মানুষদের খাদ্য-নিরাপত্তা দানের উপর ডব্লু টি ও-র দাদাদের নিষেধাজ্ঞা জারি। একটা স্বাধীন দেশের সরকার তার দেশের নাগরিকদের কত টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য ভরতুকিতে সরবরাহ করবে তা ঠিক করে দেবে ওই বিদেশী বানিয়ারা— কংগ্রেস এদের তৈরি ডব্লু টি ও-র হাতে দেশকে তুলে দিয়েছে। আজ কংগ্রেস নিজেই ফেঁসে গেছে তার তৈরি ফাঁসে। নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য তড়িঘড়ি সংসদে খাদ্য-সুরক্ষা আইন পাশ করিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু অল্প দামে খাদ্য-শস্য বিপুল সংখ্যক মানুষদের বিলি করতে-তো প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ চাল, গম। ডব্লু টি ও এদিকে মোট খাদ্য-শস্যের মূল্যের ১০ শতাংশ মাত্র মজুত করতে ও ভরতুকি দেওয়ার হুকুম জারি করেছিল। এর বেশি দিলে শাস্তি পেতে হবে। অগত্যা কংগ্রেসের মধুসূদন ইউরো মার্কিনদের পায়ে পড়া। এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল পশ্চিমী বণিকরা।

কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল আর পশ্চিমী বণিকদের লক্ষ্য ভারতের বাণিজ্যিক ক্ষমতা দখল। অতএব উভয়ের স্বার্থের সমঝোতাপত্র, যার মাধ্যমে কংগ্রেস কম দামে চাল গম বিলির ব্যবস্থা মঞ্জুর করার বিনিময়ে Trade Facilitation Agreement (TFA) মেনে নেয়। যদিও খাদ্যশস্যে ভরতুকি শুধুমাত্র ৩০ জুলাই, ২০১৪ পর্যন্ত মঞ্জুর করে। এই TFA-র অর্থ হলো দেশের জলপথ সীমান্ত, স্থলপথ সীমান্ত ও আকাশপথ সীমান্ত অর্থাৎ দেশের সমস্ত সীমান্ত বিদেশি বণিকদের জন্য সররকম বিধিনিষেধহীন করে রাখতে হবে। নিজেদের দেশে কিন্তু আমাদের আম, পানের মত পণ্যও ঢুকতে দেবে না। ছলচাতুরি করে ফেরত পাঠাবে।

আজ ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে ভারতের শাসন ক্ষমতায় বসেছে বিজেপি-র মতো রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান সম্পন্ন একটি পূর্ণমাত্রার জাতীয়তাবাদী দল। এই দলের বাণিজ্যমন্ত্রী ও জেনিভায় ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং স্থায়ী প্রতিনিধি অঞ্জলি প্রসাদ জেনিভার বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে দেশের মানুষের জন্য শস্য মজুত করা ও খাদ্যে ভরতুকি দেওয়া নিয়ে ভারতের লক্ষ্যমাত্রার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভারত টি এফ এ (বাণিজ্যিক সহায়তা চুক্তি)-তে সই করবে না। চলতি মাসেই সিডনিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির সংগঠন জি-২০-র বৈঠকেও ভারত এই চুক্তি সই নিয়ে আপত্তি তুলেছিল। খাদ্য মজুত ও ভরতুকি নিয়ে স্থায়ী সমাধান নিয়ে শক্তিধর দেশগুলোর কোনো আগ্রহই নেই। তারা এ বিষয়ে মাত্র তিনটি বৈঠক করেছে। অপরদিকে বাণিজ্যিক সহায়তা চুক্তি নিয়ে বৈঠক করেছে ২০ টিরও বেশি।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে মার্কিন সরকার ২০১২ সালে তার কৃষকদের ভরতুকি দিয়েছে ১,৮০,০০০ কোটি টাকা, ইউরোপের দেশগুলো দিয়েছে ৬,৪২০০ কোটি টাকা, চীন একাই দিয়েছে ১০ লক্ষ কোটি টাকা। আমেরিকা নিউট্রিশন প্রোগ্রামে প্রতিটি কৃষককে ভরতুকি দেয় প্রায় এক লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২৪০ কেজি খাদ্যশস্য। ডব্লু টি ও ভারতের স্বার্থে করা হয়নি। তাই ভারতের উচিত ডব্লু টি ও ছেড়ে আসা। ছোট ছোট দেশের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। ধীরে ধীরে এদের নিয়ে ব্লক বা জোট গঠন করা। ■

উত্তর দিনাজপুরের ‘তুলাইপাঞ্জি’ এখন বিদেশী মুদ্রা আনতে পারে

বাসুদেব পাল॥ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরাট দলবল নিয়ে পুঁজি (বিনিয়োগ) আনতে ৬ দিনের সফরে সিঙ্গাপুরে গিয়েছেন। সেখানকার কাগজে ফলাও বিজ্ঞাপন দিয়ে সিঙ্গাপুরীদের আকৃষ্ট করতে উদ্যোগী হয়েছে মমতা-সরকার। সেখানে একটি বিষয় হয়তো বা অনেকের নজর এড়িয়ে গিয়েছে— সিঙ্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্য ও গুণমানে সমৃদ্ধ ‘তুলাইপাঞ্জি’ চালের জন্য বাজার ধরবেন বলেও জানিয়েছেন। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, উত্তরবঙ্গ জুড়েই তুলাইপাঞ্জি চালের বাজার, চাহিদা ও কদর দীর্ঘদিন যাবৎ স্বীকৃতি। আবার, চাষিরা চাইলেও এখন অবধি তুলাইপাঞ্জি চালের ‘পেটেন্ট’ উত্তর দিনাজপুরের কৃষকদের কপালে জোটেনি। সেভাবে উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানালেও সেভাবে পেটেন্ট করানোর জন্য কেউই এগিয়ে আসেননি,— না সরকার, না অন্য কেউ।

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ব্লকের মোহিনীগঞ্জ অঞ্চল একটা সময়ে তুলাইপাঞ্জি চাষের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল। এখন আবার নতুন করে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় তুলাইপাঞ্জি চাষ হচ্ছে। তুলাইপাঞ্জি চাল বিখ্যাত হলেও ঘাম ঝরিয়ে যে কৃষকরা এই সোনার ফসল ফলাচ্ছেন তাঁরা কিন্তু সেরকম লাভবান হচ্ছেন না। তার নানা কারণ। সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলো, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তুলাইপাঞ্জি ছাপা মারা অন্য চাল ঢুকে পড়েছে। সেজন্য উত্তর দিনাজপুর জেলার চাষিরা ‘পেটেন্ট’-এর দাবি তুলেছেন। সূত্রমতে, প্রশাসন ‘তুলাইপাঞ্জি’র ‘পেটেন্ট’ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছে না, তবে ‘ট্রেডমার্ক’ দেওয়ার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে হয়েছে।

এখন তো হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, মহারাজা, করণদীঘি, মহীপুর অঞ্চলের চাষিরা তুলাইপাঞ্জি ধান চাষে জোর দিয়েছেন। কিন্তু চাষিদের সেরকম স্বার্থরক্ষাকারী রাজনীতির বাইরে কোনো জোরদার সংগঠন না থাকার জন্য সরকারি বা বেসরকারি স্তরে সহায়তা পাচ্ছেন না। জেলা সদর রায়গঞ্জে প্যাকেটে ভরে বাজার ভালো দামে বিক্রি হলেও লাভ ওঠাতে পারছেন না। সেজন্যই চাষিরা পেটেন্ট-এর উপরে জোর দিচ্ছেন। যাতে এই একই নামে অন্য কম গুণমানের চাল কেউ বাজারে চালাতে না পারে। অথচ রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রী তুলাইপাঞ্জি বিদেশে রপ্তানি করতে চান বলে সংবাদসূত্রে খবর। কদিন আগেই তিনি রায়গঞ্জ ঘুরে গিয়েছেন। এজন্য পরিকাঠামো তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। চাষে উৎসাহ, চাষের পর ন্যায্যমূল্য দিয়ে ধান সংগ্রহ করে রাইস মিলে চাল তৈরি ও প্যাকেট জাত করে রপ্তানির ব্যবস্থা হওয়া দরকার। উত্তর দিনাজপুর জেলার ৯টি ব্লকের মধ্যে হেমতাবাদ ব্লকের কৃষি আধিকারিক শ্রীকান্ত সিন্‌হা চাষিদের সবিশেষ উৎসাহিত করে চলেছেন। অন্যান্য ব্লকে এভাবে কৃষি আধিকারিকদের ক্ষেত্রে তুলাইপাঞ্জি চাষে উৎসাহ দেওয়ার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। শ্রীকান্তবাবু নিজে জমিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চাষিদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। ‘শ্রী’ প্রযুক্তিতে চাষের ফলে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ উৎপাদন বেশি হচ্ছে। সাধারণভাবে চাষ করলে বিঘা প্রতি ফলন আড়াই ক্যুইন্টালের বেশি হয় না, ‘শ্রী’ প্রযুক্তিতে প্রতি বিঘায় কমপক্ষে চার ক্যুইন্টাল ধান পাওয়া যায়। উত্তর দিনাজপুর জেলার উপ-কৃষি অধিকর্তা জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের বক্তব্য— তুলাইপাঞ্জি এক মধ্যপন্থী ধান। বীজ বপন থেকে ধান পাকা পর্যন্ত সময় লাগে ১২০ থেকে ১২৫ দিন। ‘শ্রী’ প্রযুক্তিতে লাগে ১১৩ দিন। উত্তর দিনাজপুর জেলার আনুমানিক ৬ হাজার হেক্টর জমিতে তুলাইপাঞ্জি ধান চাষ হয়। স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় তুলাইপাঞ্জি চাল রায়গঞ্জ বাজারে খুচরো যাট টাকা প্রতি কিলো দরে বিক্রি হয়। রায়গঞ্জের সবচেয়ে বড়ো বাজার ‘মোহনবাটী বাজার’। মোহনবাটী বাজারের চাল ব্যবসায়ী নীলোৎপল দত্ত বলেন, চাহিদা অনুসারে যোগান কম। তাঁর দোকানে প্রতিদিন কেবল তুলাইপাঞ্জি চাল (অন্যান্য বাদে) ৬০ টাকা প্রতি কেজি দরে এক ক্যুইন্টাল বিক্রি হয়। হেমতাবাদ থেকে তুলাইপাঞ্জি চাল দিল্লীর বাজারে যায়। এজন্য চাষিরা গর্বিত। কর্ণজোড়া কালীবাড়ির স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তুলাইপাঞ্জি চাল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ■

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

ধর্ষণ — এ কোন কালচার ?

প্রীতীশ তালুকদার

হ্যাঁ, ধর্ষণের কালচার তো ধর্ষণকালচারই। বোচারা! দাদা-দিদি, নমো-রাগা, বাপ-বেটা, ম্যাডাম-বহিনজী-আম্মা'দের ভোট- কালচারের ডামাডোলে প্রায় চাপাই পড়ে গিয়েছিল। কালচার অবশ্য থেমে থাকেনি, কিন্তু দেশের হর্তাকর্তাদের বয়ানে, টেলিভিশনের খবর ও বিশেষজ্ঞদের চুলচেরা বিশ্লেষণে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় তেমন পাত্তা পাচ্ছিল না তাই তাঁদের কৃতিত্বের দিকে মানুষেরও নজর ছিল না। সেসব শান্ত হতেই তেড়ে-ফুঁড়ে পূর্ণোদ্যমে ফের হাজির।

এ কালচার কমবেশি চিরকালই আছে, চুপি চুপি; এখন নেতা- মন্ত্রীদের অভয়হস্তের আশীর্বাদে দিনকে দিন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। বেচারা ছেলেপুলেগুলোকে সারা বছর খাটাখাটনি করতে হয়, ভোটের সময় তো তা প্রচণ্ড বেড়ে যায়; কাউবয়ের কুকুরের মতো ভুক্ ভুক্ ধমকে-চমকে ভোটার নামক গো-পাল'দের পতাকার নিচে আনা ও রাখা, বিরোধীদের চমকানো, ঠিক সময়ে ভোট-খোঁয়াড়ে পোরা, এক্সট্রা ভোটের ব্যবস্থা করা, ভোটের খরচ জোগাড় করা ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম হয়, একটু-আধটু এনজয় তো করতেই হয়; তাই পরের মেয়ে ধরে একটু-আধটু মস্তি করা। কচুগাছ কাটতে কাটতে নাকি ডাকাত হয়, নির্বিবাদে ধর্ষণকালচারের পরিচর্যা করতে করতে সাহস তো বাড়বেই, তাই মস্তির পর মেয়েটাকে দুই পা দু-দিকে টেনে ফেঁড়ে ফেলে বা রড-চালান দ্বারা 'কে কি করবে রে শালা' মানসিকতার প্রকাশ। ফের নতুন মুরগি ধরে নিলেই হবে, পথে-ঘাটে কত পরের মেয়ে চরে বেড়াচ্ছে। দেশের রাজধানী দিল্লীতেই বা একটু বেশি সাহস দেখান নয় কেন? রাজধানীর বুকে বিশেষ কিছু করতে পারলে সারা ভারত জুড়ে প্রচার পাওয়া যায়, বেশ একটা হোমরা-চোমরা ভাব আসে। তাই চলন্ত বাসে একটা পরের মেয়ে তুলে নিয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় জাহির করে গণধর্ষণ, আর তার পর আরো অভিনব পদ্ধতিতে হত্যা করে নির্ভয়ে রাজপথে ফেলে যাওয়া। এবার সমস্যা হলো, দিল্লীর প্যারামেডিক্যালের ছাত্রীর এমন পরিণতিতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কিছু একটা করা দরকার মনে করে ফেলল। গোটা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ শুরু হলো, বিশেষজ্ঞরা ধর্ষিতার মধ্যে বীরত্ব দেখলেন; নির্ভয়া, দামিনী ইত্যাদি নামে ভূষিত করলেন। তার পর ধর্ষিতা ও ধর্ষকদের নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ চুলচেরাবিশ্লেষণে নিয়োজিত হলেন, খবরের কাগজ আর সংবাদ চ্যানেল গুলোর টি আর পি হু হু করে বাড়তে লাগল, মন্ত্রীমহোদয়গণেরও হঠাৎ মনে হলো কিছু করা দরকার। ছোট বড় সব মন্ত্রী ধর্ষকদের উদ্দেশে অমোঘ শব্দবাণ প্রয়োগ করলেন— ''শক্ত সে সখ্‌ত কারবাই কি যায়েগি''। দেশবাসী তৃপ্তির ঢেকুর তুললেন ''এবার একটা বিধিব্যবস্থা হবেই''। আরে ধুস্! দেশবাসী জেনেও না জানুক, ধর্ষক লম্পট গুণ্ডারা তো জানে যে পুরুতঠাকুরের ঘণ্টার

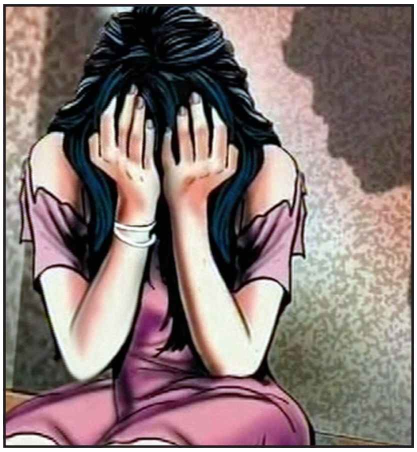

তালে তালে ঢাকটা যেমন বেজে ওঠে আর ঘণ্টা থামলেই ঢাক থেমে যায় ঠিক তেমনি করে আমাদের দেশের হর্তা-কর্তা মন্ত্রী ও নেতারা অমোঘ শব্দব্রহ্ম প্রয়োগ করেন, আর শব্দ যেমন হাওয়ার গুণ তেমনি এই শব্দের গুণও হাওয়া। ওরা ভালো করেই জানে যে, চুপি চুপি দেখা করার সময় পিঠে আদরের একটা চাপড় মেরে দাদারা বলবেন 'হারামজাদা! একটু সামলে সুমলে চলবি তো, কদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাক, টাকার দরকার থাকলে অমুকের কাছে চেয়ে নিস, আমি বলে দেব'। তাই আপনারা যতই ঢেকুর তুলুন মশাই, আমি কিন্তু একটুও ভরসা পাইনি। কেন পাব? যে ছাত্ররা রাস্তায় নেমেছিল তারা তো নারী সুরক্ষার জন্য নামেনি, অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য নামেনি; প্রকৃতই যদি বিবেকের নির্দেশে প্রতিকারের দাবিতে তা হোত তবে রাজধানীর বুকে সুশিক্ষিত ছাত্ররা দেশব্যাপী ঘটতে থাকা অসংখ্য নৃশংস ধর্ষণেই প্রতিরক্ষকের ভাষা খুঁজে পেত আগেই। সাময়িক উন্মাদনা আর 'নিজেরাও রাত-বিরেতে ঘুরি' এই স্বার্থ ছিল তাঁদের। আর সারা দেশের শহরগুলিতে যে প্রতিবাদ মিছিলে ছাত্রছাত্রী ও মানুষদের দেখা গেছে তা অর্গানাইজড্। মিছিলে অংশ নেওয়া হাসিখুশি মুখগুলো দেখেছিলেন কি? আর নেতা-মন্ত্রীরা তো বলতে হয় তাই বলেছে। ওঁরা জানে বুড়বাক দেশবাসী দু-দিন পরে সব ভুলে যাবে। বিশেষজ্ঞগণের কচকচানিও বলিহারি! ধর্ষকদের মনস্তত্ত্ব, মেয়েদের পোশাকের মতো স্পর্শকাতর জিনিস, ইস্পাতযোনি হবার বাসনা জানিয়ে পুরুষদের প্রতি শ্লেষ, ক্যারাটে শেখারও সঙ্গে লঙ্কাগুড়ো রাখার উপদেশ, আইনের ধারা-উপধারা ইত্যাদি ইত্যাদি। ধর্ষক মনস্তত্ত্বের নিকুচি করেছে! লাঠির আগায় ভূত পালায়, চাবুকের ভয়ে সার্কাসে বাঘ নাচে। মেয়েরা মেয়েদের ইচ্ছামতো পোশাক পরবে তাতে ছেলেদের বাপের কি? ইস্পাতযোনি হলে সহ্যশক্তি না হয় বাড়বে, কিন্তু ধর্ষণ কি আটকাবে? সিনেমা দেখায় যার লোভ হাউসফুলেরও তাঁর টিকিট চাই,

শক্ত লাগলে বরং চড়-থাপ্পড় বাড়বে। ক্যারাটে শিখবে কার কাছে? বিশাল দেশের গ্রামগঞ্জে এত প্রতিভা থাকতে অলিম্পিকের পদক-বিতরণ ড্যাব ড্যাব করে দেখতে হয় পরিকাঠামোর অভাবে, উনি উপদেশ জাহির করলেন 'ক্যারাটে শেখ'। তাছাড়া নির্ভীক গুণ্ডা-ধর্ষক দলের সামনে একটা মেয়ের ক্যারাটে বা লঙ্কাগুঁড়ো তেমন কোনো কাজে আসবে বলে মনে হয় না।

আইন থাকে বই-এর পাতায়, আইনের কচকচানিতে কোনো লাভ নেই। ধর্ষণ রোধে তড়িঘড়ি নেতা-মন্ত্রীদের দাওয়াই 'শক্ত আইন' তো পাশ হয়েছে, ধর্ষকদের উপর কোনো প্রভাব পড়েছে কি? আইনের বাস্তব ব্যবহারটাই আসল কথা। আইনের হাত-পা তো নেতা-মন্ত্রী পুলিশ-প্রশাসন উকিল-মোক্তার; আইন এঁদের ইচ্ছার দাস।

একটা মেয়ে ধর্ষিতা হলে প্রথমেই তাকে আত্মগ্লানি আর তার ব্যক্তিসত্তার চরম অপমান কুরে কুরে খায়। সেসব জয় করে তাকে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে হয়। তারপর পরিবারের লজ্জা ও ভবিষ্যতের চিন্তাকে পিছনে ঠেলতে হয়। এর পর গ্রাম্য দালাল নেতাদের উপদেশ, সালিশি ও চোখরাঙানি পার করে পুলিশের কাছে যেতে হবে; এবার পুলিশ পাত্তা দেবে না, পাত্তা দিলে ঘরোয়া ভাবে মিটিয়ে নেবার উপদেশ দেবে, অপদস্থ করবে, তারপর কোর্টের আদেশ বা সামাজিক চাপে অভিযোগ নেবে কিন্তু তত দিনে প্রমাণ লোপাট হবে, যাঁদের নামে অভিযোগ করা হবে পুলিশ তাঁদের নাম বাদ দিয়ে অন্য নাম ঢোকাবে, আসামী গা ঢাকা দেবে। এবার ধর্ষক আর পুলিশে কানামাছি খেলা চলতে থাকবে আর ধর্ষিতা ও তাঁর পরিবার ধর্ষক ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক নেতাদের দ্বারা আতঙ্কিত ও অত্যাচারিত হতে থাকবে। অপর দিকে তদন্তের অনন্ত খেলা চলতে থাকবে, আসামীকে পুলিশ দেখতে পাবে না তাই আসামী ফেরার থাকবে, কোর্ট পুলিশকে ভর্ৎসনা করে হাঁপিয়ে যাবে, ব্যাস। বাস্তবে আইনের অসম্পূর্ণতা বা অক্ষমতা কোথায়? ধর্ষণ রোধ ও ধর্ষকের শাস্তি দেশের পুলিশ-প্রশাসন, মোড়ল, নেতা, দাদা, মন্ত্রীরা কেউ চায় না, তাই হয় না। এরকম 'বিশেষ-অজ্ঞ'রা দেশের মুণ্ডু হলে ধর্ষণ, গুণ্ডামী, চুরি-চামারী-ই তো দেশের সংস্কৃতি হবেই।

সবাই বাহবা দিয়ে চলেছে দাদাগিরি, গুণ্ডামি, মস্তানী, চুরি, ডাকাতি লুঠপাঠ ও ধর্ষণে। আমাদের রাজ্যের দিদি, যিনি এখন বাংলার ভাগ্য বিধাত্রী, তিনি সিংহাসনে বসার আগে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ছিলেন নাকি। মানুষের জন্য চিৎকার চেঁচামেচির কারণে তাঁর গলাকে সুস্থ রাখার জন্য আদা-গোলমরিচ মেশানো লিকার চা সব সময় নাকি সঙ্গে রাখতে হোত। কোনো এক মুসলমান যুবক রিজোয়ানুর হিন্দু মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে মরেছে, খুন না আত্মহত্যা তা তদন্ত সাপেক্ষ। সেই রিজোয়ানুরের দুঃখে দিদি এতটাই ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হলেন যে ছোটাছুটিতে প্রতি আড়াই দিনে এক জোড়া করে চপ্পল ক্ষয়ে যেতে লাগল, আদা-গোলমরিচের চা অকেজো করে গলা ভাঙতে লাগল। দিদি এতটাই ব্যথিত হলেন যে রিজোয়ানুরের দাদা রুকবানুরকে এমএলএ বানিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই দিদি যখন মানুষের আশাভরসা নিয়ে গদিতে বসলেন, যখন পার্কস্ট্রিট, দুর্গাপুর, কাটোয়া, খর্জুনা, বারাসাত, কামদুনি, দমদম (মধ্যমগ্রাম) সহ অসংখ্য ধর্ষণ ও ধর্ষণ করে নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটতে থাকল, তখন তিনি ধর্ষিতাদের চারিত্রিক দোষ আর বিরোধী পক্ষের চক্রান্তের কথা বলে নিজেও সরকারি ভাবে সেই ধর্ষিতা ও নারী জাতিকে অপমান করে, ধর্ষকদের আড়াল করে, প্রতিবাদীদের অর্থের টোপ নতুবা হুমকি দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে, একগুঁয়ে প্রতিবাদীদের নামে কেস ঠুকে ধর্ষকদের মনোবল বৃদ্ধি করলেন। উত্তরপ্রদেশ সরকারের পিতাজী; তিনি তো ধর্ষকদের ধর্ষণকে ছেলেপুলের ছেলেমানুষি মনে করেন। তাই বদায়ুঁ, বরেলিতে আদরের ছেলেমানুষরা আস্কারা পেয়ে ছেলেমানুষি করে ফেলল। কত আর উদাহরণ দেব! আমরাই তো বাছাই করে এঁদের শাসক বানাই, আমাদের ঘরের ছেলেরাই তো নেতা-পুলিশ হয়। সুতরাং ধর্ষণ-কালচার চলছে চলবে। মোদীজী এসেছেন, উনি ব্যতিক্রমী ব্যক্তি, তাঁর কাছে প্রত্যাশা আছে; তবে একা মোদী গোটা ভারতের থানার হাবিলদার, পাড়ার মোড়ল হতে প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব তো সামলাতে পারবেন না।

আমার কিছু টিপস্ আছে, আপাতত সে গুলোই মেনে চলুন।

(১) সিংহভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ষকরা আপনাদের সুপরিচিত। আপনাদেরই সস্নেহ প্রশ্রয়ে পাড়ার গলিতে, মোড়ে মাতলামি, গুণ্ডাগিরি, মস্তানি, ইভটিজিং করতে করতে ধর্ষক হয়ে ওঠে। মনে রাখবেন যে, আপনারা ভদ্রলোক; যে ভাবে উদাসীন থেকে ওদের বাড়তে দিয়েছেন তেমনই দেবেন, সমাজের জন্য আপনাদের কোনো দায়িত্ব নেই। (২) এই ধর্ষক ও গুণ্ডারা এখনও আপনাদের মেয়েদের প্রতিদিনই রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করবে। আপনারা প্রতিবাদ না করে আপনার মেয়েকে ধর্ষণ না করা পর্যন্ত বাড়তে দিন, মেয়েকে শিখিয়ে দিন ধর্ষণে বাধা না দিতে ও ভয় না দেখাতে। তাতে প্রাণটা বেঁচে যেতে পারে। (৩) ওই গুণ্ডা-মস্তানদের সঙ্গী করে নেতারা ভোট চাইতে এলে কোনো প্রশ্ন না করে তাঁদের ভোট দেবেন, কেমন মানুষকে ভোট দিচ্ছেন তা বিচার করবেন না, বিচারবোধ যেমন দেখাননি তেমনই দেখাবেন না। (৪) মা-বাবারা যেমন ভাবে টিভিতে ছ্যাবলা সিরিয়াল দেখা ও তার আলোচনায় মত্ত থাকেন তেমন থাকবেন; পরিবেশ-পরিস্থিতি, বিপদ ও সাবধানতা বিষয়ে যেমন মেয়েদের সচেতন করেন না, তেমনই করবেন না। (৫) মেয়েরা নারীমুক্তি ও নারী স্বাধীনতার কথা গলা ফুলিয়ে বলবেন, পুরুষ জাতিকে গালি দেবেন, কিন্তু যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করবেন না, নিজেদের বাঁচানোর যোগ্যতা ও সাবধানতা অর্জন ও গ্রহণ করবেন না। (৬) ঘটনা ঘটে গেলে চুপচাপ থাকুন : ঘর পুড়বে না, জীবন হারাবেন না। (৭) কোনো দিন অন্য রকম কিছু করার ভাবনা মনে জাগলে প্রথমেই নিজ নিজ এলাকার সমস্ত পুলিশ ও বড় মেজ সেজ দাদাদের চোখের ছানির গণ-অপারেশন করবেন। ■

নিষিদ্ধপল্লীতে 'চৈতন্য'

রাজদীপ মিশ্র॥ পতিতাবৃত্তির ঘনকালো অন্ধকারে যে সমস্ত মহিলারা পরিস্থিতির চাপে পড়ে নিমজ্জিত হতে বাধ্য হন, তাঁদের সন্তানদের করুণ অবস্থা আমরা কি কখনো ভেবেছি? সমাজের আর পাঁচটা শিশুর মতো তারা কিন্তু অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত। স্কুলে যাওয়া থেকে শুরু করে গান শেখা, ছবি আঁকা, পিতৃ-মাতৃ পরিচয়—

নিষিদ্ধপল্লীর ছেলেমেয়েরা আঁকায় ব্যস্ত।

ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তাদেরকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তারা নিজেদের চোখে তাদের মায়েদের শোষিত হতে, অত্যাচারিত হতে দেখছে; দেখছে এবং অনুভব করছে যে কিছু মানুষের স্বার্থসিদ্ধিতে তাদের মায়েদের জোর করে কাজে লাগানো হয়। এইসব শিশুদের একটা বড় অংশ বড় হয়ে অপরাধ জগতে এবং নেশার জগতে সহজেই প্রবেশ করে।

এইসব বিপথগামী এবং হতভাগ্য শিশুদের ওই অন্ধকার থেকে তুলে আনতে এবং সমাজে তাদের একটা ন্যূনতম স্থান করে দেওয়ার জন্য মহারাষ্ট্রের পুণে শহরের 'চৈতন্য মহিলা মণ্ডল, কাজ শুরু করেছে। স্থানীয় একটি নিষিদ্ধপল্লীর সন্তানদের জন্য ওই সংস্থা একটি রাত্রিকালীন 'ক্রেশ' (কর্মরত মায়ের শিশুদের দেখাশুনার জন্য শিশুনিকেতন) স্থাপন করেছে। ওই শিশুদের মধ্যে সংস্কারের বীজ বপন করে তাদের জীবনে এক আশার আলো দেখানোর যে কাজ 'চৈতন্য মহিলা মণ্ডল' শুরু করেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

খারাপ হলেও সমাজে আজও দেহ-ব্যবসা প্রচলিত। এই মহিলাদের দুরবস্থার ব্যাপারে সমাজে প্রায় সবাই অবহিত। কিন্তু এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভয়াবহ দিক হলো ওই সমস্ত মহিলাদের সন্তান। কোনো মহিলাই স্বেচ্ছায় এই বৃত্তিতে প্রবেশ করেন না। কোনো না কোনো জটিল অবস্থার প্রেক্ষাপটে মহিলারা এই অন্ধকূপে নিমজ্জিত হন এবং এই স্থান থেকে বেরোনোর রাস্তা প্রায় চিরকালের মতো বন্ধ। দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের নির্দোষ সন্তানরা বিনা কারণে সমাজে অবহেলিত থেকে সহজেই অপরাধ জগতে নেমে পড়ে। মাতৃত্বের অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও এইসব মহিলারা তাঁদের সন্তানদের উন্নতির জন্য প্রায় কিছুই করতে পারেন না। প্রকৃতিতে সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওইসব শিশুদের জীবনেও অন্ধকার নেমে আসে। রাত্রির অন্ধকার তাদের কাছে আরো গভীর যন্ত্রণায় পরিণত হয়, যখন তারা তাদের মাকে শোষিত হতে দেখে। রাত্রে ঘুমোনোর সময় তারা তাদের মায়েদের কোল খোঁজে। কিন্তু হায়! বাস্তবের রূঢ় ভূমিতেই তাদের ঘুমোতে হয়। এই সন্তানরা যখন একটু বড় হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ নানারকম বদভ্যাসের শিকার হয়। কেউ কেউ আবার নানারকম নেশাদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়। তাদের মনে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং সমাজও তাদের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করা থেকে পিছিয়ে আসে।

এইসব শিশুদের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে 'চৈতন্য মহিলা মণ্ডল' পুণের ওই নিষিদ্ধ পল্লীতে যায় তাদের সমস্যার কথা সবিস্তারে জানতে। সবদিক বিবেচনা করে তারা ওইসব সন্তানদের জন্য একটি রাত্রিকালীন 'ক্রেশ' শুরু করার ব্যাপারে মনস্থির করেন। আর এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন জ্যোতি পাঠানিয়া। পুণের চাকান ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে তিনি বিশাল ব্যবসার কাজ দেখাশোনা করেন। এই গুরু দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের এইসব অবহেলিত শিশুদের জন্যও তিনি সময় দেন। সমমনভাবাপন্ন কিছু মহিলাদের নিয়ে তিনি এই কাজে নিয়োজিত হয়েছেন এবং এইভাবেই তিনি চৈতন্য মহিলা মণ্ডলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

পুণের ভোসরি অঞ্চলের কাছে অবস্থিত 'চৈতন্য মহিলা মণ্ডল'। হতভাগ্য মহিলা ও তাঁদের সন্তানদের উন্নতিকল্পে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটির নাম 'উৎকর্ষ প্রকল্প'। কার্যকর্তারা এই প্রকল্পে প্রতিদিন রাত্রি ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। কার্যকর্তারা ওই এলাকায় গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সন্তানদের এই 'ক্রেশে' নিয়ে আসেন। সেখানে বাচ্চাদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়, প্রেরণাদায়ী গল্প শোনানো হয় এবং নানা ধরনের খেলাধুলা করানো হয়। বাচ্চারা এখানে মায়ের স্নেহ- ভালোবাসা পায় এবং এখানকার কার্যকর্তাদের সঙ্গে তাদের একটি আত্মিক মেলবন্ধন গড়ে উঠেছে। ওইসব শিশুদের নানারকম ভালো সংস্কার দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা ভবিষ্যতে সু-নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। কার্যকর্তারা সবসময় চিন্তাভাবনা করছেন, যাতে করে এই সব শিশুরা সমাজের অন্য শিশুদের মতো সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে।

ওই সমস্ত মহিলাদের অভিশপ্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে মণ্ডল কার্যকর্তারা মহিলাদের স্বনির্ভর রোজগার যোজনা এবং ক্ষুদ্র শিল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেবার চিন্তাভাবনা করছেন। এভাবে তাঁরা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং সমাজে একটি শ্রদ্ধার স্থান অর্জন করতে পারবেন।

মণ্ডল কার্যকর্তারা দিবা বিভাগের জন্যও একটি 'ক্রেশ' খোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। ■

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার, গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"সুবিশাল পৌরাণিক কাহিনীসম্ভার থাকা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের মূল অন্যান্য ধর্মের তুলনায়, এই সব কাহিনীর উপর অনন্ত গুণে কম নির্ভরশীল।

যেহেতু ভারতীয় চিন্তাধারার ভিত্তি মানব-মনের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সংযুক্ত, ঐতিহাসিক উন্নতির প্রতিটি নূতন ক্ষেত্রে তাই পুরাতন জ্ঞানের সঙ্গে নূতন সংযোজন করতে তার ত্রুটি হয়নি।

ভারতের পূর্ণ ইতিহাস তার একটিমাত্র দার্শনিক মতবাদের মধ্যেই পাঠ করা যায়।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

বদহজম, অম্বল ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

হজম না হওয়া মানে বদহজম, আর অম্বল এখন অনেকরই প্রধান সমস্যা। বুক জ্বালা, পেট ব্যথা, ঢেকুর তোলা, বমি, পেট খারাপ সব নিয়ে দুর্বিসহ অবস্থা। আমাদের শরীরে মুখগহ্বর থেকে পায়ু পর্যন্ত মোট ২১ ফুট লম্বা নল আছে। তার বেশিরভাগ অংশ প্যাঁচানো এবং কোনো কোনো অংশ কুঞ্চিত। মুখগহ্বর থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রান্ত্র পর্যন্ত বিভিন্ন পদ্ধতিতে গৃহীত খাদ্যের হজম প্রক্রিয়া চলে। মুখগহ্বরের প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত টায়ালিন থেকে এই কাজ শুরু হয়। এই উৎসেচক খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যকে জারিত হতে সাহায্য করে। কণ্ঠনালীর কাছে থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন বা উৎসেচকের ক্ষরণ কম বা বেশি হলেও হজমের বিঘ্ন ঘটে। হজমের প্রক্রিয়ায় শরীরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় লিভার, যার কাজকর্মে অসুবিধা হলে হজম ঠিকমত হয় না। পিত্তথলির অসুস্থতা বা জারক রসের অভাব ঘটলে এই সমস্যা দেখা যায়। খাদ্যনালীর ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রদাহজনিত বা জীবাণুঘটিত অসুখের জন্যও হজমের সমস্যা হয়। খাদ্যনালীর গুরুত্বপূর্ণ গৃহীত খাদ্যের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জারিত হয় পাকস্থলীতে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সহ ক্ষরিত অ্যাসিডের ভূমিকা অপরিসীম। পাকস্থলী নিঃসৃত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যদি নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষরণ না হয় বা ক্ষরিত অ্যাসিডের পরিমাণের মধ্যে ক্ষমতা না থাকে অর্থাৎ অ্যাসিড কম বা বেশি ক্ষরিত হয় তাহলেও বদহজম অবশ্যম্ভাবী।

অন্যদিকে মুখে স্বাদ টক হলে অনেকেই ভাবি অ্যাসিড হয়েছে, ব্যাপারটা তা নয়। শরীরে ব্যাকটেরিয়া স্পারমেনটেশন হলে মুখটা টক হয়ে যায়। পাকস্থলীর পেশিগুলির কার্যকরী ক্ষমতা হ্রাস পাওয়াকে বলে অ্যানোটিক। এর জন্য পাকস্থলীর গ্রন্থিগুলি নিজের কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে পরিমাণের চেয়ে বেশি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাকস্থলীর মধ্যে চলে আসে, তখন দেখা যায় পেট জ্বালা, গলা জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ। গুরুপাক খাবার, ভালো করে চিবিয়ে না খাওয়া বা দীর্ঘক্ষণ পেট খালি রাখা ইত্যাদি অম্বল বা অ্যাসিডিটির কারণ। অতিরিক্ত টেনশন, মানসিক অবসন্নতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, হতাশা ইত্যাদি মানসিক অসুস্থতার কারণে আমাদের পরিপাক গ্রন্থিসমূহে প্রভাব পড়ে। ফলে গ্রন্থিগুলি অ্যাসিড সিক্রিয়েশনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। পাকস্থলীতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে অম্বলের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যায়। তাই অম্বল বা বদহজম বা হজমের গণ্ডগোল একে অন্যের হাত ধরেই আসে, যার কোনোটাকেই একরকম ভাবে দেখা উচিত নয়।

শারীরবৃত্তীয় কারণ : দেহগত অসুবিধাজনক অর্থাৎ খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক, আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় জড়িত অঙ্গগুলি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে পেটের গণ্ডগোল শুরু হয়। অন্যদিকে মানসিক দুর্বলতা যেমন বহু মানুষ শুধুমাত্র মানসিক দুর্বলতার কারণে ক্রনিক পেটের রোগের শিকার হয়ে পড়েন।

বহিরাগত কোনো আণুবীক্ষণিক বায়ুজীবী জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ জনিত কারণ : বাতাসে ভাসমান অদৃশ্য বহু জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে পেটের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। অম্বল, বদহজম-পেটের এই ধরনের উপদ্রবকে ডাক্তারি মতে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যথা নন আলসার ডিসপেপসিয়া এবং আলসারেটিভ অধিকাংশ মানুষের উপসর্গ থাকে পেটে গ্যাস, দাঁত ক্ষয়ে যাওয়া, মুখের স্বাদ টকে যাওয়া, মাথা ব্যথা ইত্যাদি। এইগুলি নন-আলসারেটিভ ডিসপেপসিয়ার অন্তর্গত। অন্যদিকে বুক পেটের সংযোগ স্থলে ব্যথা, পেটজ্বালা, রাত্রে ঘুম না হওয়া ইত্যাদি আলসার ডিসপেপসিয়ার লক্ষণ তাদের সাধারণত অম্বল উপসর্গ থাকে না। বদহমজ ও অম্বল জনিত সমস্যায় মুড়ি মুড়কির মতো অ্যান্টাসিড না খেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। মনে রাখবেন, অ্যান্টাসিড অতিরিক্ত অ্যাসিডকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করে বটে, কিন্তু তাতে অতিরিক্ত ক্ষরণের মূল কারণগুলির কিছুমাত্র উন্নতি ঘটে না। আবার প্রশমিত হয়ে যাওয়ার পর অ্যান্টাসিডের ক্ষারত্ব পাকস্থলীর দেওয়ালকে উদ্দীপ্ত করে। ফলে একটু পরেই অ্যাসিড ক্ষরণের হার বেড়ে যায়। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। দরকার মতো এন্ডোস্কোপি করে দেখা হয় রোগী বিক্লাকস ইসোফেহাইটিস-এ আক্রান্ত কিনা। এই অসুখে যে অ্যাসিড পাকস্থলীতে থাকার কথা তা ঠেলে খাদ্য নালীতে উঠে আসে। বদহজম, অম্বল ঠেকাতে জলের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাস্থ্যের সহায়ক জল বেশি পরিমাণ খেলে পায়খানা পরিষ্কার হয়, দিনে ৩-৪ লিটার বিশেষ দরকার।

প্রচুর তেলমশলা দেওয়া রান্না করা খাবার খাওয়া একেবারে বর্জন করতে হবে। অতিরিক্ত তেল শরীরে শোধিত হওয়ার সময় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বেশি পরিমাণ দরকার হয়ে পড়ে তখন শরীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। তামাক প্রীতি ছাড়তে হবে। সিগারেট, বিড়ি, খৈনী, জর্দা, পান নিকোটিন জাতীয় নেশার দ্রব্য বর্জন করতে হবে। চা, কফি ত্যাগ করতে হবে।

সমাবেশ সমাচার

রাখিবন্ধন উৎসব

গত ১০ আগস্ট খুবই আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে সংস্কার ভারতী, উত্তরপাড়া শাখার রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। ভাবসঙ্গীতের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। স্থান— স্বামী নিঃসম্বলানন্দ গার্লস কলেজ মোড়। সকাল ১০টা থেকে ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত উৎসব চলে। ৩০০ জনের বেশি ভাইবোনেদের হাতে রাখি পরানো হয়। পথ চলতি আপামর জনতার হাতে সকলেই আনন্দের সঙ্গে রাখি পরান এবং সৌভ্রাতৃত্বের একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠে। শাখার সদস্য ও সদস্যাবৃন্দদের প্রভূত উৎসাহ প্রদান করেন সাধারণ মানুষ। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন শাখার সদস্য/সদস্যা— লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস, দিলীপ কুমার দাস, সুবীর মল্লিক, শৈবাল চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুপ্ত, অনিমেশ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী, কৃষ্ণা চক্রবর্তী এবং রত্না বসু রায়।

***

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিভাগ প্রচারক আশিস কুমার মণ্ডল এবং ব্যবস্থা প্রমুখ অনিল গোয়েলের উপস্থিতিতে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয় স্থানীয় প্রশাসনিক ভবনে। সেখানে ১২ জন আই এ এস সহ মুখ্যসচিবের হাতে রাখি পরানো হয়। প্রশাসনিক আধিকারিকরাও তাঁদেরকে অভিনন্দন এবং স্বাগত জানান। এই ১২ জন সচিবের মধ্যে ২ জন আই এ এস আধিকারিক ছোটবেলায় শাখায় যাওয়ার কথাও ব্যক্ত করেন। স্থানীয় প্রশাসনিক ভবন ছাড়াও দক্ষিণ আন্দামানের ডেপুটি কমিশনারের অফিস, এস ডি এম অফিস, এস পি অফিসের আধিকারিকদের হাতে রাখি পরানো হয়।

***

গত ১৫ আগস্ট বিজেপি হুগলী চুঁচুড়া মণ্ডলের পরিচালনায় স্বাধীনতা দিবস ও ভারতমাতা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ তারিখ ভারতমাতা পূজার উদ্বোধন করেন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা। অনুষ্ঠানে জেলার সভানেত্রী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য ও জেলার এবং মণ্ডলের নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও বহু ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই বছর পূজা অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করল। বৃষ্টি-বাদল সত্ত্বেও অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য হুগলী-চুচুঁড়া মণ্ডলের বিজেপি নেতৃত্ব সকলের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

***

মেদিনীপুর নগরে গত ১০ আগস্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে স্থানীয় বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরে পারিবারিক সম্মেলনে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয়। প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ভাল ছিল। অনুষ্ঠানে প্রাস্তবিক বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট গবেষক ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রমুখ ড. জিষ্ণু বসু। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক ডাঃ কে সি পাল। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর বিভাগ সঙ্ঘচালক লহর মজুমদার, বিভাগ সহ-সঙ্ঘচালক চন্দন কান্তি ভুঁইয়া, মেদিনীপুর জেলা সঙ্ঘচালক ঠাকুরদাস অধিকারী, মেদিনীপুর নগর সঙ্ঘচালক মৃগাঙ্ক শেখর মাইতি-সহ বিশিষ্ট কার্যকর্তারা। পরস্পরের মধ্যে রাখিবন্ধনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

***

গত ১৪ আগস্ট কলকাতার কেশব ভবন সভাগারে (৯এ অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৬) ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের উদ্যোগে মহাসমারোহে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে চিকিৎসক, ছাত্র ও হোমিও অনুরাগীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে রাখিবন্ধনের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপালজী। শুভ সচনা হয়েছিল প্রদীপ প্রজ্বলন, গান ও সুভাষিত পাঠের মধ্য দিয়ে। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত এবং ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের সভাপতি ডাঃ সুকুমার মণ্ডল। অনুষ্ঠানে সংগঠন পরিচিতি এবং বার্ষিক কার্যপ্রবাহ নিবেদন করেন কার্যালয় প্রমুখ ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক, ডাঃ নির্ঝর অধিকারী এবং সহ সভাপতি ডাঃ পার্থ কুণ্ডু। কার্যক্রম শেষে রাঙা সুতো পরানো হয় পরস্পরের হাতে।

***

গত ১০ আগস্ট পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম সিউড়ীনগর সমিতির উদ্যোগে রাখিবন্ধন উৎসব স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দির সংলগ্ন অনুষ্ঠান মঞ্চে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাঁওতালী ভাষা সাহিত্যিক ও বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক লক্ষ্মণ হাঁসদা। প্রধান অতিথি ছিলেন বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও সংস্কৃত পণ্ডিত জীমূতবাহন ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শুভানন্দ মহারাজ। প্রধান বক্তা ছিলেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান বীরভূম জেলার মাঝিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিবাকর কুণ্ডু। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট নাগরিক ভারত সেবাশ্রমস্থিত বনবাসী ছাত্র-সহ প্রায় দুই শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা রাখিবন্ধনের তাৎপর্য কল্যাণ আশ্রমের কর্মধারা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সবশেষে একে অপরকে রাখিবন্ধন করে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত করে তোলেন। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বীরভূম শাখার সম্পাদক বিশ্বনাথ দে সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

***

আসানসোল জেলার ফরিদপুর খণ্ডের ইছাপুর অঞ্চলে সেবা বিভাগের পরিচালনায় গত ১০ আগস্ট চারটি গ্রামে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। বিভিন্ন সেবা প্রকল্পের ছাত্র-ছাত্রী এবং দাদাভাই ও দিদিভাইরা শোভাযাত্রা-সহ গ্রাম পরিক্রমা করে গ্রামবাসী ও পথচলতি ব্যক্তিদের হাতে রাখি বেঁধে দেন। প্রায় ৪ হাজার জনসম্পর্ক করা হয়। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। সারাদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। চারটি গ্রামেই সেবা বিভাগের কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন স্থানে জন্মাষ্টমী উৎসব

গত ১৯ আগস্ট, ২০১৪, মঙ্গলবার উত্তরপাড়া শাখার উদ্যোগে সখের বাজার ভদ্রকালী স্বামী নিঃসম্বলানন্দ গার্লস কলেজের ধর্মচক্র সভাগৃহে মহাধুমধামের সহিত জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। সন্ধ্যায় সমবেত ভাবসঙ্গীতের পরে ১৪ মাস থেকে ৯ বৎসর পর্যন্ত ৩০ জন শিশু অপূর্ব রূপ ও সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বাল্যলীলা প্রদর্শন করে

সভাগৃহকে সম্পূর্ণরূপে নববৃন্দাবনে পরিণত করে। প্রদেশের সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু সংক্ষেপে জন্মাষ্টমী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এরপরে শাখার সভাপতি অধ্যাপক বিজয় কুমার চক্রবর্তী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সবশেষে ভরত কুণ্ডু এবং বিজয় কুমার চক্রবর্তী প্রত্যেক শিশুর হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শাখার সম্পাদক লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস।

***

সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখার উদ্যোগে কৃষ্ণ রূপসজ্জায় কেউ মাখন চোর, কেউ চক্রধারী, কেউ বালগোপাল— এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিতে বহুরূপে নবকিশোর নটবর যশোদানন্দন কৃষ্ণের স্বরূপ ফুটে উঠল শিশুদের মধ্যে।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৪৬ জন খুদে কৃষ্ণের মিলন হয়েছিল সিউড়ি সিধু কানহু মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণে। উপস্থিত শিশুরা শুধু কৃষ্ণ সেজেই ক্ষান্ত থাকেনি। রীতিমতো মাখন চুরির দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছে অভিনয়ের মাধ্যমে। কেউ বা গীতা শ্লোক উচ্চারণ করে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবের তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেছে আপন মুন্সিয়ানায়। আবার কোনো শিশু বংশীধ্বনি দিয়ে ব্রজগোপিনীদের সঙ্গে শ্রীরাধাকে আহ্বান করার দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছে সফল অভিনয়ের মাধ্যমে। এই নব নব রূপে খুদে কৃষ্ণদের দেখতে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রতিযোগিতায় বিচারক রূপে উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব রজ সাহা, চিত্রশিল্পী সারথি দাস। প্রত্যেক শিল্পীর হাতে মানপত্র তুলে দেওয়া হয় সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী যথাক্রমে শুদ্ধব্রত ভাদুড়ি, অংশু দে, তৃষ্ণা দাসকে পুরস্কার তুলে দেন বিচারকবৃন্দ। মানপত্র তুলে দেন উপদেষ্টা সদস্য যদুপতি দত্ত, লক্ষণ বিষ্ণু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় বংশীধর দাস ও সুদীপ চ্যাটার্জি।

***

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (দক্ষিণ কলকাতা) জন্মাষ্টমী উৎসবের ২৬তম বছরের অনুষ্ঠান বাঁশদ্রোণী, ৩১০ এন এস সি বোস রোডের অনুষ্ঠান বাড়িতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এই বছরে মোট ১৮১ জন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন (বসে আঁকো ১২৮, কৃষ্ণ সাজো ১৮, দীপ প্রজ্বলন ১৮, শঙ্খ বাদন ১৭)। সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ২০০ জনের বেশি নারী, পুরুষ অংশ নিয়েছিলেন। প্রসাদ নিয়েছেন ৮০০ জনের বেশি। অধ্যাপিকা দীপা ব্যানার্জী কৃষ্ণ জীবন আলোচনা করেন এবং গৌরাঙ্গ ধর পর্ষদের ৫০ বছরের ইতিহাস তথা হিন্দু স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের কথা বর্ণনা করেন। সঙ্গীতে অংশ নেন শাশ্বতী সরকার, জয়ন্তী দাস, মহুয়া ভদ্র এবং পুরনো দিনের গায়িকা মীরা বিশ্বাস।

***

কলকাতার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলনীর (চালতাবাগান) হলে বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে মহাসমারোহে জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করা হয়। ১৭ আগস্ট সন্ধ্যার এই অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। রীণা রায় ও হেনা দত্তর গাওয়া 'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এসো সুদর্শনধারী মুরারী' গানটি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। শ্রীকৃষ্ণ জীবন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তুষারকান্তি মজুমদার। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দত্ত ও অরুণেন্দু দত্ত। সংগঠন সম্পাদক ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন।

***

অন্যান্য বারের মতো ১৭ আগস্ট সাড়ম্বরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচালনায় কোলড়া অরুণাশ্রম প্রাঙ্গণে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা দিবস সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন শ্রীমৎ তিতিক্ষানন্দ মহারাজ। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন স্বস্তিকা পত্রিকার অভিজিৎ রায়চৌধুরী এবং সমীর সিনহা।

অরুণাশ্রম সেবা সঙ্ঘের কলকাতার কার্যকর্তা শ্রীকুবের প্রসাদ জয়সোয়াল দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বস্ত্র দান করেন। প্রায় ৫০০ জন কৃষ্ণভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে ২২ জন শিশু কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে বলাগড় প্রখণ্ডের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি তপন মুখার্জী, বিশিষ্ট সমাজ সেবী সুশীল ভট্টাচার্য, রতন সরকার, শিশির রায় উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

পরলোকে বৈজ্ঞানিক নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য

গত ১৩ আগস্ট বিখ্যাত অণু-বিজ্ঞানী ড. নারায়ণ ভট্টাচার্য কলকাতায় পরলোকগমন করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ,

সায়েন্স কলেজ ও সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের কৃতী ছাত্র ছিলেন নারায়ণ ভট্টাচার্য। তিনি পেশায় ছিলেন ত্বরণযন্ত্র পদার্থ বিজ্ঞানী। মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৮৭-৮৮) ভিজিটিং অধ্যাপক ছিলেন। এরপর ১৯৯৫-৯৬ সালে জাপান সরকারের Monbusho ফেলোশিপ পেয়ে এক বছর জাপানে গবেষণা করেন। এরপর জার্মানি ও ফ্রান্সে গবেষণা করেন। ভাবা রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকেই তিনি অবসর নিয়েছিলেন। তিনি সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চা করেছেন। তাঁর প্রথমে ছাত্রজীবনে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' লেখায় হাতে খড়ি। তারপর 'সন্দেশ' আজকাল, স্বস্তিকা কাগজে বিভিন্ন বিষয়ে লেখেন। বৈজ্ঞানিক হয়ে ইতিহাস নিয়েও লিখেছেন প্রাকমহেঞ্জোদড়ো মেহেরগড় সভ্যতা। সরস্বতী নদীর উৎস সন্ধানে তিনি আই এস আর ও-র সাহায্য নিয়ে গবেষণা করেন ও এই বিষয়ে তাঁর লেখা ও বক্তৃতা আমাদের মুগ্ধ করেছে।

তিনি জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ ও এসিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সদস্য। বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশনের তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। বাজপেয়ীর এনডিএ সরকার যখন পরমাণু বিস্ফোরণ করে তখন বামপন্থীরা চরম বিরোধিতা করেছিল। সেই সময় এই বিস্ফোরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে তিনি ভাষণ দিয়েছেন।

পারিবারিক সূত্রে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সঙ্ঘচালক অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর ভাগনে ছিলেন। স্ত্রী ছাড়াও বিদেশে কর্মরত এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর লেখা 'আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও সমকালীন বঙ্গসমাজ' অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

***

হাওড়া জেলার বানিবন খণ্ডের বানিবন জগদীশপুর শাখার স্বয়ংসেবক মৃত্যুঞ্জয় কর্মকারের ভাই নবকুমার কর্মকার গত ১২ আগস্ট রাত্রে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। উল্লেখ, তিনি রামমন্দির আন্দোলনের সময় করসেবায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

***

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া নগরের প্রথম শাখার প্রথম মুখ্যশিক্ষক অরিন্দম সিংহরায়ের মাতৃদেবী সুষমা সিংহরায় গত ১৪ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ৪ পুত্র ও পুত্রবধূ ৩ কন্যা ও নাতিনাতনি রেখে গেছেন।

***

গত ১৮ আগস্ট সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ তরুণ বর্মনের মাতৃদেবী বামনীবালা বর্মন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ২ পুত্র, পুত্রবধূ, ৬ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

কলকাতা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও খড়্গপুর আই আই টি-র অধ্যাপক ড.পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদেব রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ আগস্ট কলকাতায় নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় আশি বৎসর।

তিনি বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। স্ত্রী, তিন পুত্র, এক কন্যা এবং পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি সঙ্ঘের একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন।

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যার (১৪২১) প্রকাশ অনুষ্ঠান

সকলকে সাদর আমন্ত্রণ

২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, শনিবার, সন্ধ্যা ৬টা

ভারত সভা হল কলকাতা

(ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল,

পুঁটে কালীবাড়ির বিপরীতে

বৌ-বাজার সেন্ট্রাল এভিনিউর সংযোগস্থলে)

অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরির বুনোহাঁস

বিকাশ ভট্টাচার্য

গতানুগতিকতার বাইরে এক অন্য ধরনের ছবি নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে পা রেখেছিলেন পরিচালক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরি। অন্তহীন, অনুরণন এবং অপরাজিতা তুমি— তিনটি ছবিই নরনারীর বিশেষত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে তৈরি। নির্মাণ সৌকর্য দর্শক- সাধারণকে মুগ্ধ করেছিল। দু-দু'টো

বুনোহাঁস-এর একটি দৃশ্য।

জাতীয় পুরস্কারও তিনি ইতিমধ্যে পেয়েছেন। এবারের ছবিটি একটু অন্যধরনের। গত বছর এক পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস 'বুনোহাঁস'। নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা আছে, তবে বেশিটাই সাসপেন্স। থ্রিলারধর্মী এই ছবির প্রথম থেকেই পড়তে পড়তে উত্তেজনা। একটা কি হয়, কি হয় ভাব। দর্শকেরা পর্দা থেকে চোখ সরাতে পারেন না। তবে পরিচালকের মুন্সিয়ানায় ছবিতে এসেছে এক স্নিগ্ধ প্রেম। ভালবাসাও।

কাহিনীর মুখ্য চরিত্র অমল। এক মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত ছেলে। সুদর্শন মার্জিত যুবক। পরিবারে বিধবা মা, দাদা ও বৌদি। দাদা সামান্য চাকরি করে। বাঁয়ে আনতে ডাঁয়ে কুলোয় না। অমল একটা মল-এ সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করে। সব মিলিয়েও অভাব মেটে না। দাদা এখনও পর্যন্ত সন্তানের কথা ভাবতে পারে না। মা তার বোনের কাছে এলাহাবাদে যেতে চায়। ট্রেনের টিকিট কাটার সঙ্কুলানও নেই। অমলের ভালবাসার জন সোহাগ। প্রাণবন্ত এক মেয়ে। হঠাৎ জানা গেল তার ক্যান্সার। এখনি কেমোথেরাপি করতে হবে। অমল দিশাহারা। যে করেই হোক তাকে আয় বাড়াতে হবে। চাই ক্যুইক মানি, ইজি মানি। ঠিক এরকম সময়েই অমলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার স্কুলের বন্ধু রবিনের (অনিন্দ্য)। জড়িয়ে পড়ল বেআইনি এক পাচার চক্রে। যার মালকিন ম্যাডাম (মুনমুন সেন)। আজ ঢাকা, কাল ব্যাঙ্কক যাতায়াত। প্যাকেট আনলেই 'ক্যুইক মানি' হাতে। মা-র এলাহাবাদ যাওয়ার খরচ, সোহাগের কেমোথেরাপির টাকা সব আসতে থাকে।

কিন্তু সভ্য-ভদ্র পরিবারের একটা ছেলে হঠাৎ খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়লে কি হয়? অতল তলে তলিয়ে যায়। ধীরে ধীরে ডন হয়ে ওঠে, নাকি সুযোগমত পাপচক্র থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারে? গল্পটা আমাদের খুব একটা অচেনা নয়। অনেক গল্প বা ছবি এই বিষয়ে আমরা পড়েছি বা দেখেছি। কিন্তু এই ছবিতে পরিচালক অনিরুদ্ধ কাহিনীকে এমন ভাবে আমাদের সামনে এনেছেন যাতে পড়তে পড়তে উত্তেজনা আমাদের টান টান করে রেখেছে। প্রথম বাহবা দেবো অমল চরিত্রে বর্তমান বাণিজ্যিক ছবির জনপ্রিয় নায়ক দেব-কে নির্বাচন করায়। দেব-এর মুখে একটা নিষ্পাপ ভাব আছে যেটা অমলের চরিত্র করতে কাজে লেগেছে। কখনও মনে হয়নি দেব অভিনয় করছে। বরঞ্চ এক অসহায়— যেন পরিস্থিতির শিকার এক ছেলে অমলই আমাদের সামনে চলাফেরা করছে। চাঁদের পাহাড়-এর পর বুনোহাঁস এক কথায় অভিনেতা দেবকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিল। সোহাগের ভূমিকায় শ্রাবন্তীও অনবদ্য অভিনয় করেছে। অপর্ণা সেনের গয়নার বাক্সতেই শ্রাবন্তীর অন্য ধারার ছবিতে অভিনয়ের সূচনা হয়েছে। 'বুনোহাঁস' তার আর এক অর্জন। মা ও বৌদির ভূমিকায় সোহাগ সেন ও সুদীপ্তা চক্রবর্তী যেন শুটিং জোনে অভিনয় করেননি। এক ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারে অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। বিশেষত সুদীপ্তার অভিনয় মনে রাখার মতো। অমলের পাপের পথে যাত্রার অন্যতম সঙ্গী বিজুরির ভূমিকায় তনুশ্রী এক মূল্যবোধহীন লোভী মেয়ের চরিত্র অত্যন্ত দক্ষতায় রূপ দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় শান্তিলাল, শুভ্রজিৎ, অলকানন্দা রায়, মুনমুন সেন এবং রবীনের ভূমিকায় অনিন্দ্য সুন্দর। সঙ্গীত এ ছবির প্রাণ। শান্তনু মৈত্র অনিরুদ্ধের আগের ছবিতেও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। এ ছবিতে একদিকে থ্রিলার, উত্তেজনা অন্যদিকে বাংলাদেশের সবুজে ঘেরা প্রান্তর এই দুই দৃশ্য তাঁর আবহসঙ্গীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এক লোকসঙ্গীতের সুরে 'আমি আইলাম কোনখান' এবং পপ গানের ছোঁয়ায় 'এসেছে রাত ভিজে হাওয়া' এখনই লোকের মুখে মুখে ফিরছে। পদ্মাপারে বসে অমলের ভিজে মাটি তুলে কপালে মাখানো, সোহাগের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানো, ব্যাঙ্ককে রেসের মাঠে অমলের রিঅ্যাকসন এবং মুম্বাই-এর শুনশান রাস্তায় প্রাণভয়ে লম্বা দৌড়— এমন সব অনবদ্য মুহূর্ত পরিচালক অনিরুদ্ধ আমাদের উপহার দিয়েছেন— যা এক কথায় অসামান্য। ছবির গতি এনেছে হরিন্দর সিং-এর সিনেমাটোগ্রাফি ও অর্ঘ্যকমল মিত্রের সুচারু সম্পাদনা। ছবিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছে রিলায়েন্স এন্টারটেনমেন্ট ও ওপাস।

শব্দরূপ-৭২১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

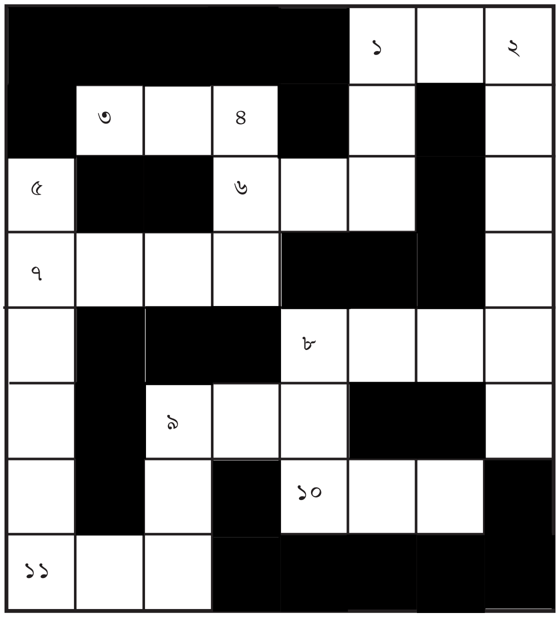

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. ঋষিবিশেষ, মরীচিপুত্র, দেব দৈত্য প্রাণী ইত্যাদির জনক, **৩.** 'জলের রূপোলি শস্য'—গঙ্গার না পদ্মার ভালো, বিতর্ক চলুক, **৬.** এক ধরনের চোখের প্রসাধনী, **৭.** কার্তিকেয়; তারক নামক অসুরকে যিনি বধ করেছিলেন, **৮.** মহাভারতে উল্লিখিত ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা, **৯.** 'কোথায় জলে—চলে' রাজহংস, **১০.** দানব; কশ্যপপত্নী দনুর গর্ভজাত, **১১.** নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-সৃষ্ট পটলডাঙার সেই বিখ্যাত চরিত্র।

উপর-নীচ : ১. সগরবংশ ধ্বংসকারী মুনি, **২.** স্পর্শমণি, যার স্পর্শে অন্যধাতু সোনা হয়, **৪.** বিক্রমাদিত্য যিনি শকগণকে দমন করেন, **৫.** হাত জোড় করে, **৮.**মেঘ, **৯.** পশমী শীতবস্ত্র বিশেষ।

সমাধান
শব্দরূপ-৭১৮
সঠিক উত্তরদাতা

রমেন বর্মন
ফাটাপুকুর,
জলপাইগুড়ি
সুমন মাহাতো
পুরুলিয়া

	ম	হা	শ্বে	তা		মা	ছি
ম	ধু		ত	ল		ন	
র	মা			ন		ম	
	স্টা		দ্র	ব	ম	য়ী	র
শ	র			মী	ন		ক্ত
ক্ত		খ					
	অ	র্জু	ন	ব	র্মা		র
		র		ল			তি

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭২১ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংখ্যায়

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কোটিপতি হোন!

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company

'Park Plaza'

71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–

emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

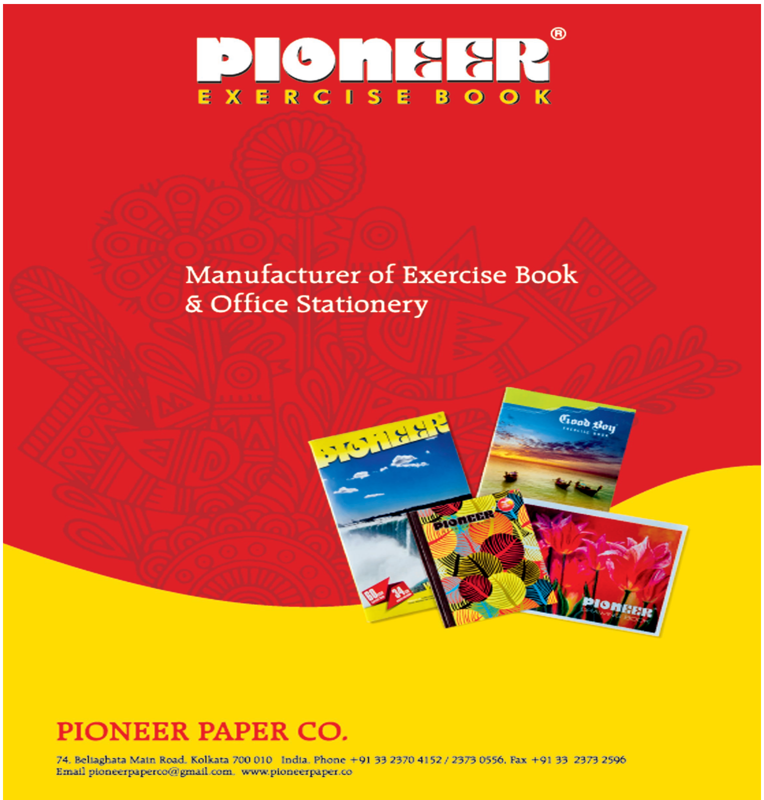

চিরায়ত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাবলী

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন কৃত
আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ (চারখণ্ডে) ১০০০৲
সংস্কৃত মূলপাঠ ও টীকাসহ সরল বঙ্গানুবাদে
কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা (চারখণ্ডে) ৮০০৲

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
প্রাচীন ভারতের আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়ন চিন্তা ৩০০৲

মহর্ষি সুশ্রুত বিরচিত
সুশ্রুত সংহিতা (চারখণ্ডে) ৮০০৲
মহর্ষি শার্ঙ্গধর বিরচিত
শার্ঙ্গধর ঃ চিকিৎসা সংগ্রহ ১৭৫৲
শ্রীচক্রপাণি দত্ত বিরচিত **চক্রদত্ত** ২২০৲
শ্রী রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদ সোপান ১০০৲
মহামতি শ্রীমৎ মাধবকর বিরচিত **নিদান** ৩৫০৲
(রোগবিজ্ঞান, রোগনির্ণয়-সংগ্রহ ও নাড়ীজ্ঞান রহস্য গ্রন্থ তিনটি সংযোজিত)
শ্রীমৎ রাখাল দত্ত কবিরাজ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদীয় ফলিত চিকিৎসাবিধান ২৭৫৲
মহর্ষি বাগভট **অষ্টাঙ্গহৃদয়** (দুইখণ্ডে) ৪০০৲
মহামুনি কণাদ বিরচিত
নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ ৭৫৲
আচার্য ভাবমিশ্র বিরচিত
ভাবপ্রকাশ (চার খণ্ডে) ১২০০৲
আচার্য গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বিরচিত
রসেন্দ্রসার সংগ্রহ ২০০৲
মহর্ষি বাগভট বিরচিত
রসরত্নসমুচ্চয় (দুই খণ্ডে) ৬০০৲
(রসরহস্য বিজ্ঞানম ও পরিভাষা প্রদীপ গ্রন্থ দুইটি সংযোজিত)
অধ্যক্ষ সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন কৃত
কায়চিকিৎসা ২৫০৲
ভিষগ্বর গোবিন্দদাস বিশারদ বিরচিত
ভৈষজ্য রত্নাবলী (তিনখণ্ডে) ৭০০৲
অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক
আয়ুর্ব্বেদ সিদ্ধান্ত ঃ দর্শন ও পদার্থসূত্র ২২৫৲
আয়ুর্ব্বেদ সংকলন ২২৫৲
(শারীরবিজ্ঞান, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা, আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস, সহজ রোগনির্ণয়)

সদ্য প্রকাশিত নতুন সংস্করণ

মহর্ষি চরক বিরচিত
চরক সংহিতা (প্রথম খণ্ড) ৩৫০৲
সুত্রস্থান।। নিদানস্থান।। বিমানস্থান।।
চরক সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড) ৪০০৲
শারীরস্থান।। ইন্দ্রিয়স্থান।। চিকিৎসিত স্থান।। (প্রথমাংশ)
চরক সংহিতা (তৃতীয় খণ্ড) ৩৫০৲
চিকিৎসিত স্থান (শেষাংশ)।। সিদ্ধিস্থান।। কল্পস্থান।।

দীপায়ন
২০, কেশব সেন স্ট্রিট, কল-৯
☎ ২২৪১-৪১৫০
E-mail : deepayan07@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোরস, দে'জ পাবলিশিং, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, মহেশ লাইব্রেরি

জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার অপরূপ মেলবন্ধন

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা : ১৪২১

● দেবীপ্রসঙ্গ : দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা — **স্বামী অরুণানন্দ**
● দিব্যজীবন : গৌরীমা — **সবুজকলি সেন**

উপন্যাস

● **শেখর সেনগুপ্ত** — তন্ত্রাচার্যের ডায়েরি ● **সুমিত্রা ঘোষ**— জল রংয়ে আঁকা ছবি মুছে যায়
● **সৌমিক ঘোষ**— হীরের আংটি

প্রবন্ধ

● **রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী** — ইসলামে নারীর স্থান : আফজল খাঁ ও ৬৩ জন বিবির হৃদয়বিদারক উপাখ্যান
● **অচিন্ত্য বিশ্বাস** — বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চিত্তরঞ্জন সুতারের অবদান ● **তথাগত রায়** — কেন এই ধর্ষণবন্যা?
● **প্রণব চট্টোপাধ্যায়**— সার্ধশতবর্ষে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর : ঐতিহ্য, আধুনিকতা, বিজ্ঞান সাধনা ও স্বদেশ চেতনা
● **রবিরঞ্জন সেন** — হিন্দুত্বের রক্ষক দেবেন্দ্রনাথ ● **সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**— ভারতীয় চলচ্চিত্রে জাতীয়তাবাদ
● **গোপাল চক্রবর্তী**— কলকাতার পেশাদারি থিয়েটারের উত্থান ও পতন ● **তুষারকান্তি ঘোষ** — হিন্দুধর্ম ও বর্তমান বিশ্ব
● **অরিন্দম মুখোপাধ্যায়**— বাংলা-ব্রহ্মদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ● **গোপেশচন্দ্র সরকার**— যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোয় জন্মান্তরবাদ তত্ত্ব ● **অর্ণব নাগ**— বই বৈ তো নয় ● **সৌমেন নিয়োগী**— আজিবক তীর্থ— বরাবর ও নাগার্জুনই পাহাড়
● **বাসুদেব ধর**— বিপন্ন ঐতিহ্য, বিপন্ন সভ্যতা ● **দেবীপ্রসাদ রায়**— আমাদের সার্বিক অবক্ষয়ের কারণ : জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণে ব্যর্থতা।

বিচিত্র রচনা

● **তাপস অধিকারী**— চড়াই তুমি ভালো থেকো ● **সুন্দর মৌলিক** — স্টেশনের কথা।

জীবনকথা

● **বিজয় আঢ্য**— এক অপরাজেয় যোদ্ধা।

গল্প

● **রমানাথ রায়**— শেষ বয়সের গল্প ● **শেখর বসু**— সেকেলে ডাকাতের নীতি ● **গোপালকৃষ্ণ রায়**— ধাই মা
● **জিষ্ণু বসু**— সাদা হাতি কালো মাহুত ● **তপন বন্দ্যোপাধ্যায়**— ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো
● **সৌমিত্র দাশগুপ্ত**— ইয়েসস্যার ● **সুনীল আচার্য**— আর্তদিন ● **মেখলা মিত্র**— ভ্যানিসিং পাউডার।

রম্যরচনা

● **চণ্ডী লাহিড়ী**— নিজের রাজ্য, নিজের বাঙালি।

এছাড়াও অন্যান্য রচনায় সমৃদ্ধ।

সবমিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো
একটি সংরক্ষণযোগ্য পূজা সংখ্যা

সত্বর কপি বুক করুন।। মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।। দাম : ৭০ টাকা।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
1 September - 2014

দাম : ১০.০০ টাকা